স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।। ২৩ জুলাই - ২০১২।। ৭ শ্রাবণ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮
সাংবাদিকদের প্রতি ক্ষুদে মন্ত্রীর উপদেশ—
'নেগেটিভ নয় পজিটিভ চিন্তা করুন' ▯ ৯
কেন্দ্র-মমতা সংঘর্ষ চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে ▯ ১০
খোলা চিঠি : উচ্চশিক্ষা বড় ব্রাত্য : অস্থায়ীরাই চালাচ্ছেন
বিশ্ববিদ্যালয় ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১
আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি ▯ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২
দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রসঙ্গে ▯ বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ১৪
তুমি যে হে প্রাণের বঁধূ ▯ অর্ণব নাগ ▯ ১৬
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাবলী ▯ ১৮
বিলুপ্তির পথে কৃষি উৎসব : ঢেঁকি চুরি ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১
পরমহংস নিগমানন্দ : 'ফোর ইন ওয়ান' ▯ কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ২২
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা ▯ শিবাজী গুপ্ত ▯ ২৭
জাতীয় দলগুলি গুরুত্ব হারাচ্ছে ▯ এস কে সিন্‌হা ▯ ২৮
কর্ণাটকে চমকপ্রদ সাফল্যের সঙ্গে হয়ে গেল ২০১২
'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সম্মেলন' ▯ ৩০
উত্তরপ্রদেশে সপা সরকারের ১০০ দিন :
মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ পরিণত 'অপরাধ যাদব'-এ ▯ ৩১
অসম চুক্তির ২৬ বছর পরেও অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে
একটিও ফ্লাডলাইট লাগানো হয়নি ▯ ৩২
ভারতের কমিউনিস্টদের 'আঁতুড়ঘর' জে এন ইউ-তে 'বিপ্লব' ▯ ৩৫
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯
সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৮▯ ▯ ▯ পুস্তক-প্রসঙ্গ : ৩৯ ▯
শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৭ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৩ জুলাই - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

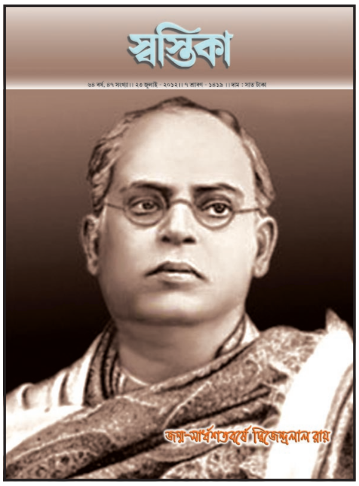

ডি এল রায় প্রসঙ্গে
পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬
হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : মুখে মুখে দেবভাষা

সংস্কৃত যে আক্ষরিক অর্থেই দেবভাষা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মুখে এই ভাষার ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ উচ্চারণের কাঠিন্য বরাবরই অন্তরায় হয়েছে বলে একটা অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখেও কিভাবে তাকে দৈনন্দিন জীবনচর্যার অঙ্গ হিসেবে কথ্যভাষায় রূপদান করা যায় তা দেখিয়েছে সংস্কৃতভারতীর সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির। আর এই সরল সম্ভাষণ পদ্ধতির রচয়িতা ও বাস্তবায়িত করার সফল ব্যক্তিত্ব চ. মূ. কৃষ্ণশাস্ত্রীর মুখোমুখি স্বস্তিকা। অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে অকপট শাস্ত্রীজী শোনালেন সংস্কৃত আন্দোলনের অনেক অজানা কথা।
থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও।

দাম একই থাকছে — সাত টাকা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাতীয় লজ্জা

সম্প্রতি গুয়াহাটির ব্যস্ত রাস্তায় প্রকাশ্যে এক নাবালিকার ভয়াবহ ও নারকীয় শ্লীলতাহানির ঘটনায় অসমে তো বটেই, সারা দেশ জুড়িয়া প্রতিবাদ, ক্ষোভের ঝড় বহিতেছে। ঘটনার দিন, ৯ জুলাই, দুই বান্ধবীকে সঙ্গে লইয়া একাদশ শ্রেণীর এক তরুণী একটি পানশালায় গিয়াছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে সেখান হইতে বাহিরে আসেন। সেই সময় একটি দোকানের সামনে দাঁড়ানো কিছু ছেলে তাঁহাদের ছবি তুলিতে যাইতে তাঁহারা প্রতিবাদ জানান। তখনই আশপাশ হইতে বেশ কয়েকজন তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরে। তাঁহার দুই বান্ধবী পালাইতে পারিলেও তিনি আটকাইয়া পড়েন। রাত ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত গুয়াহাটির খৃস্টান বস্তি এলাকায় জি এস রোডে কয়েক হাজার পথচারী ও সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁহাকে নিগ্রহ করা হয়।

এই নারকীয় ঘটনায় তরুণ গগৈ-এর প্রশাসনের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হইয়াছে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময়সীমাও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হইয়াছে। অভিযুক্তদের ছবি সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পোস্টারও সাঁটা হইয়াছে। ইতিমধ্যে অসমের সমাজকর্মী অখিল গগৈয়ের অভিযোগ ঘিরিয়া তোলপাড় শুরু হইয়াছে। স্থানীয় একটি নিউজ চ্যানেলের এক সাংবাদিকই মত্ত অবস্থায় মেয়েটির শ্লীলতাহানিতে 'উস্কানি দিয়েছেন' বলিয়া তাঁহার অভিযোগ। ওই সাংবাদিকই নারকীয় ঘটনাটির ছবি তুলিয়াছিলেন। তবে সংশ্লিষ্ট চ্যানেলটি এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন তাহা অস্বীকার করিয়াছে। যদিও ওই সাংবাদিকের তোলা ভিডিও ফুটেজ দেখিয়াই অভিযুক্ত ১৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রথমে এই ভিডিও ক্লিপ দেখানো হইয়াছে স্থানীয় টিভি চ্যানেলে। সেখান হইতে ক্লিপ ছড়াইয়াছে ইন্টারনেটে। ওই ক্লিপ লইয়া এরপর জাতীয় সংবাদমাধ্যম তোলপাড় করিয়াছে। একই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী হইতে অসম—প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সক্রিয় হইয়াছেন। পুলিশের ভূমিকা, সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সবরকম সম্ভাব্য প্রশ্ন উঠিয়া আসিয়াছে। জাতীয় মহিলা কমিশন হইতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, মুখ্যমন্ত্রী হইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কংগ্রেস-বিজেপি-বামেদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব—সকলেই ঘটনার নিন্দায় মুখর হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং তদন্ত হইবে বলিয়া প্রশাসনের পক্ষ হইতে আশ্বস্তও করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইল, এই আশ্বাস কতটা আস্থাযোগ্য? কেননা এই গুয়াহাটিতেই ২০০৭-এর ২৪ নভেম্বর অল আদিবাসী স্টুডেন্টস-এর এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অফিস হইতে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে এক জনজাতি তরুণীর শ্লীলতাহানি হইয়াছিল। এরপর (২৮.১২.২০১০) গুয়াহাটির চণ্ডীমারী এলাকায় এক মিজো মহিলা পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। শুধু অসম কেন, অভিযোগ—উত্তর-পূর্বের মেয়েদের কাছে খোদ দিল্লী শহরটাও ধর্ষণের রাজধানী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা এক জাতীয় লজ্জা।

প্রশ্ন উঠিয়াছে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা লইয়াও। যদিও এই বিতর্ক বহু পুরনো। ১৯৬০ সালে জাপানের সোশ্যালিস্ট নেতা ইনজিরো আসানুমা টিভি ক্যামেরার সামনে বক্তৃতা দিতে দিতেই খুন হইয়া যান। তখনও প্রশ্ন উঠিয়াছিল, সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ছবি না তুলিয়া ছুটিয়া যাইলেন না কেন? এইসব ঘটনার কথা স্মরণ রাখিয়াও বলিতে হয় সংবাদমাধ্যমের কর্মী প্রথমে একজন মানুষ, দেশের নাগরিক। কর্তব্য সাধনের ধারাবাহিকতায় প্রথমটিই অগ্রগণ্য।

শ্লীলতাহানির শাস্তির বিষয়টি লইয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই দেশে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি দুই হাজার টাকা জরিমানা। আর মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করিলে ন্যূনতম জরিমানা মাত্র ৫০০ টাকা বা এক মাসের জেল। আর এই ধরনের ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ মাত্র দুই বছরের জেল। নারী নিগ্রহের অপরাধে এই শাস্তিকে হাস্যকর ছাড়া আর কি বলা যায়? ফলে অপরাধীরা আরও প্রশ্রয় পাইতেছে। যদিও ধর্ষণ বা নারীর শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা প্রতিরোধে এই রাজ্যে ধনঞ্জয়-কে ফাঁসিতে ঝোলানো হইয়াছে। এই 'জাতীয় লজ্জা'-কে মুছিবার জন্য অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই নীতিটি মানিয়া লইতে অনুরোধ করি—'কিছু নষ্ট করিও না', ধ্বংসবাদী সংস্কারকগণ জগতের কোনও উপকারই করিতে পারে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙিও না, একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, বরং গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকো, এবং যেমন চলিতেছে চলিতে দাও। যদি সাহায্য করিতে না পারো, অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ মানুষ অকপট থাকে, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিও না।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সেনা তদন্তে নির্দোষ কর্ণেল পুরোহিত

‘গৈরিক সন্ত্রাস’-এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণে ব্যর্থ আই এন এ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০০৮-এ মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় প্রধান অভিযুক্ত কর্ণেল শ্রীকান্ত পুরোহিতকে সেনা-আদালত (Army's Court of Inquiry) ক্লীন-চীট দেওয়াতে হিন্দু-সন্ত্রাসবাদ-এর তত্ত্ব আর ধোপে টিকছে না। এর ফলে সাধ্বী প্রজ্ঞা, স্বামী অসীমানন্দ এবং অন্য যাদেরকে সমঝোতা এক্সপ্রেস সহ কয়েকটি বিস্ফোরণের মামলায়

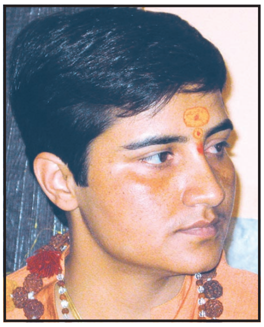

সাধ্বী প্রজ্ঞা

কর্ণেল পুরোহিত

স্বামী অসীমানন্দ

জড়িত সন্দেহে জেলে দীর্ঘদিন যাবৎ আটক রাখাটা রীতিমতো সন্দেহজনক হয়ে পড়ল। সিবিআই থেকে শুরু করে এ টি এস এবং হালফিল গঠিত এন আই এ (National Investigation Agency) পর্যন্ত কয়েক বছরে তাদের বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি। কয়েকটা বছর কেটে গেলেও এই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও চার্জশীট দায়ের করা হয়নি। শ্রী পুরোহিতকে ক্লীন চিট দেওয়ার ফলে মক্কা মসজিদ, মালেগাঁও প্রভৃতি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ধৃত হুজি, লস্কর এ তৈবা, সিমি প্রভৃতি জেহাদি মুসলিম সংগঠনের দুষ্কৃতীদের তাড়াহুড়ো করে ছেড়ে দেওয়া নিয়েপ্রশ্ন উঠেছে। পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলে আটক মুসলমান দুষ্কৃতীদের ক্লীন চিট দিয়ে মুক্ত করে দেয় কংগ্রেস সরকার। এখন বোঝা যাচ্ছে— মুসলমান ভোট ব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেক হিসাব কষে হিন্দুদের বদনাম করার জন্যই ওই মুসলিম অভিযুক্তদের মুক্ত করা হয়েছিল।

সূত্রমতে, সাউদার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারের ব্রিগেডিয়ার স্তরের একজন সেনা অফিসার তদন্ত-রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। ৬০ জন সাক্ষীর একজনও কর্ণেলের সন্ত্রাসবাদী হওয়ার পক্ষে কোনওরকম উল্লেখ করেননি। অপরপক্ষে বলা যায়, ৬০ জন সাক্ষীকে জেরা করেও কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। ২০০৯-এর ৭ এপ্রিল সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছিল। ২০১০-এর ১ সেপ্টেম্বর প্রথম দফার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। পুরো ঘটনাই রেকর্ড করা হয়। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর কর্ণেল পুরোহিত সশস্ত্র বাহিনীর ট্রাইব্যুনালে আপীল করেন। অভিযুক্ত অফিসার সাক্ষীদের ক্রশ-চেক (পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ) করার সুযোগ পাননি বলে আর্মড্ ফোর্সেস্ ট্রাইব্যুনাল তদন্ত শুরু করে। যদিও পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা রয়েছে সেনা আইনে।

এই সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের সময় তখন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নাড়া দেওয়ার মতো কিছু ঘটনা ও তথ্য প্রকাশ পায়। বারবার বলা হয়েছিল দক্ষিণপন্থী উগ্রবাদী সংগঠন ‘অভিনব ভারত’-এ কর্ণেল পুরোহিত ঢুকে পড়েছিলেন। তাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুরোহিতের এ বিষয় বক্তব্য হলো— যেহেতু তিনি সেনা গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন, সেজন্য খবর সংগ্রহ করতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন— এটা তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। শ্রী পুরোহিত জানিয়েছিলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের জ্ঞাতসারেই তিনি ‘অভিনব ভারত’-এ গিয়েছিলেন। এসব কথা কর্ণেল পুরোহিত সংবাদমাধ্যমে (একটি পত্রিকা) জানিয়েছেন। শ্রী পুরোহিত সেনা ট্রাইব্যুনালে তার আবেদনে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

এইসব বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় এন আই এ-র বেলুন চুপসে দিয়েছে। গত বছর মহারাষ্ট্র এ টি এস-এর কাছ থেকে কেস হাতে নেওয়ার পর এন আই এ পুরোহিতের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ হন্যে হয়ে ঘুরছে। পুরোহিতকে তাদের হেফাজতে নিতে হলে প্রমাণ পেতে হবে। পুরোহিতকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে না পেরে এখন এন আই এ বলছে পুরোহিতের ‘অভিনব ভারত’-এ ঢুকে পড়ার জন্য সেনাবিভাগ থেকে কোনও নির্দেশ ছিল না।

এখানে উল্লেখ্য, ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে এক শুক্রবার মালেগাঁও এর মসজিদ-এর সামনে এক বিস্ফোরণে ছয়জন মারা যায়। একমাস পরে মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এ টি এস) দাবী করে ওই ঘটনায় এক হিন্দু দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী দায়ী। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে তখন কর্ণেল পুরোহিত কর্মরত ছিলেন। তাঁকে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। সেনাবিভাগও কোনও ভাবনাচিন্তা না করে, ট্রাইব্যুনালে না গিয়ে আগে পিছে না ভেবে কর্ণেলকে এ টি এস-এর হাতে তুলে দেয়। এখন তো কমপক্ষে ৫০ জন সেনা অফিসার বলছেন, পুরোহিতকে অনৈতিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। কর্ণেল পুরোহিত অভিনব ভারত-এ অনুপ্রবেশ করেছিলেন প্রমাণ সংগ্রহের জন্য, তিনি ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন না।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক— ‘সেনা বিভাগের তরফে কে ছিল, যার নির্দেশে সব পরিচালিত হয়েছে।’ যখনই বলা হয়েছে, কিছু দক্ষিণপন্থী হিন্দু জড়িত তখন অবশ্যই গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে এই অভিযোগের বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার। সাধারণভাবে এরকমই হয়। সেনাকে ওই কাজে কেন লাগানো হয়েছিল। এই প্রথমবার সেনাকে মিথ্যেভাবে নির্দোষ লোকেদের দোষী ও সন্ত্রাসে যুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে। কর্ণেল পুরোহিত দাবী করেছেন তাঁর উর্ধ্বতন অফিসাররা তাঁর

কাজের বিষয়ে আগে থেকে সবকিছু অবগত ছিলেন। সেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারা, যাদের নির্দেশে কর্নেল এই কাজে নেমেছিলেন। তারা কি ভারতীয় না বিদেশী? তাদের রাজনৈতিক রং কি ছিল? না তারা অরাজনৈতিক ব্যক্তি? যদি রাজনৈতিক হয় তাহলে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না প্রতিরক্ষামন্ত্রী অথবা অন্য কেউ? তাদের গূঢ় উদ্দেশ্য কি ছিল? কারা সরকারি সংস্থাকে এভাবে অপব্যবহার করল হিন্দু দেশপ্রেমিক ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে? শ্রী পুরোহিতের এই অপারেশনে তাঁর সঙ্গী কারা ছিল?

ঘটনা হলো এই কর্মকাণ্ডের পিছনে যে ব্যাপক ভারত-বিরোধী-হিন্দু বিরোধী ষড়যন্ত্র রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে তাদেরকে কড়া শাস্তি দেওয়া তাই খুব জরুরি। তাদের নাম-ধাম সর্বসমক্ষে প্রকাশ হওয়া চাই। দেশের মানুষ জানুক ওরা কারা। এই ষড়যন্ত্রের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দিক রয়েছে তা জানা দরকার। এখানে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর উন্মোচিত হওয়া দরকার। ভারতে রাজনৈতিক বিরোধিতার সুযোগে কেউ কি বিদেশের হাতে খেলছে? কেননা এতদিন আমরা ভারত-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী পাক-জেহাদিদেরকে দোষারোপ করতাম। কিন্তু ওই ষড়যন্ত্রের ফলে পাকিস্তান এখন ভারতের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ করছে। সন্ত্রাসের জন্য ভারতকে দোষারোপ করছে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সিমি, লস্কর-এ-তৈবা, হুজি ও আই এস আই-এর ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপক চর্চা, আলোচনা, সমালোচনা হোত। এবার 'স্যাফ্রন টেরর বা গৈরিক সন্ত্রাস'-এর তত্ত্ব আমদানির ফলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। ভারতকে কোণঠাসা করে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় নামিয়ে দিয়েছে। সেনাবিভাগের তদন্তও ইউপিএ সরকারকে বেকায়দায় ফেলল। যদি কর্ণেল পুরোহিত মালেগাঁও বিস্ফোরণে দোষী না হন তাহলে সাধবী প্রজ্ঞা অথবা স্বামী অসীমানন্দও দোষী নন। তাই আর কালক্ষেপ না করে তাদেরকে কি জেল থেকে মুক্ত করা উচিত নয়? এই নবীনতম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের বরিষ্ঠ উকিল ভূপিন্দর যাদব বলেছেন, তদন্ত সংস্থাগুলো স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্ত করছে না। আমরা কোনওরকম হিংসা সমর্থন করি না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে, ছক কষে পরিকল্পনা মাফিক নির্দোষ ব্যক্তিদের মিথ্যে অভিযোগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সকল এই সন্ত্রাসবাদী গতিবিধির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ আই এস আই এবং পাকিস্তান মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে দোষারোপ করেছে। শ্রী যাদব আরও বলেছেন, আমাদের তদন্ত সংস্থাগুলোর দায়িত্বসহকারে স্বচ্ছতার সঙ্গে ওরকম ঘটনার তদন্ত করা উচিত।

মালদার হরিশচন্দ্রপুরে মন্দিরের জায়গা দখল করে নিচ্ছে মুসলিমরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালদা॥ মালদা জেলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান এখন আর সুরক্ষিত নয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্মশান ও উপাসনালয়গুলি দখল করে সেখানে মুসলিমদের মাজার বা উপাসনালয় তৈরি হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে বলে কোনও উপকার হচ্ছে না। মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত দৌলতনগর খিদিরপুর গ্রামের ফুলহার নদীর তীরে গোবরা ঘাট শিবমন্দির ও শ্মশানের মাঝখানে গত মহরমের সময় মুসলিমরা তাদের তাজিয়ার শেষে ইমামবাড়াটি রেখে যায়। হিন্দুরা এই কাঠামো রাখার প্রতিবাদ জানালে তারা বলে আমরা এটি সরিয়ে নেব। কিন্তু গত ১৫ জুন রাতারাতি ওই স্থানে একটি ইঁটের কাঠামো তৈরি শুরু হয়ে যায় যেটি এখনও পর্যন্ত ভাঙা হয়নি। স্থানীয় জনগণ প্রশাসনকে এই বেআইনী কাঠামো তৈরির কথা জানানোর পরও কাঠামো তৈরির কাজ রাতের অন্ধকারে করা হচ্ছে। গত ২০ জুন চাঁচল আদালত এক নির্দেশ দিয়েছে যাতে বলা হয়েছে ওই এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে ইঁটের কাঠামো তৈরির কাজ বন্ধ রাখতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই স্থানটিতে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্মী ও হনুমান মন্দিরও রয়েছে এবং শিবরাত্রির পর থেকে তিনদিন ধরে বিশাল মেলা হয়। সেখানে ২০-২৫ হাজার ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। ওই বেআইনী কাঠামো না ভাঙা হলে শিবমন্দিরের ঢিলছোঁড়া দূরত্বে থাকা কাঠামো হিন্দুদের কাছে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা পাবে না। এমত অবস্থায় জেলা প্রশাসন মুসলিমদের স্বার্থে চুপ করে থাকলেও হিন্দুরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানিয়েছে। যদিও স্থানটি সেচ দপ্তরের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু শিবমন্দির কমিটি তার জন্য প্রতি বছর টাকা দিয়ে থাকে এবং সরকারি রসিদ গ্রহণ করে থাকে। সরকারি অনুমতিতে হিন্দুরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে পূজা ও উপাসনা করে আসছে। এই জমিরই সদর অংশে মুসলমানরা ইঁটের দোকান তৈরি করে ব্যবসা করে চলেছে। অথচ এই শিবমন্দির সংলগ্ন স্থানটি মেলার জন্য এবং হিন্দুদের জন্য ছাড়া ছিল।

এদিকে হরিশচন্দ্রপুরের আই সি-কে এই বেআইনী কাঠামো তৈরির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি মুখ খুলতে চাননি। এই কাঠামো তৈরিতে সিপিএম এবং কংগ্রেসের মুসলিম নেতারা এখন এক হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি শেখ দানেশ এবং সিপিএম সভাপতি শেখ খালিল এই কাঠামো তৈরিতে মদত জোগাচ্ছে বলে জানা গেছে। কুখ্যাত অপরাধীরা, যার মধ্যে জাল টাকার ব্যবসায়ী শেখ মতি সহ, শেখ দানেশ, শেখ রাহিব, মতিউর রহমানরা জমি দখল করার সঙ্গে জড়িত আছে এবং এদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রশাসন এদের গ্রেপ্তার করেনি। যেহেতু হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু এবং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্যরা সবাই মুসলিম, সুতরাং প্রশাসন এখানে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে ভোটব্যাঙ্ক নষ্ট করবে না এটাই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে আগামী দিনে এইসব অঞ্চলের হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানগুলি কতটা হিন্দুদের দখলে থাকবে এটাই এখন বড় প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশী মহিলাকে দিয়ে ভারতীয় অফিসারকে ব্ল্যাকমেল

সংবাদদাতা ॥ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ভারত বিরোধিতা এবং ওদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজকে দেশচ্যুত বাস্তুচ্যুত করার জেহাদি প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এবার এক বাংলাদেশী মহিলার ষড়যন্ত্রে তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে চাকরি যেতে বসেছে লেফট্যানেন্ট কর্নেল র‍্যাঙ্কের এক অফিসারের। ওই অফিসার রাজস্থানের সুরতগড় জেলায় কর্মরত, তিনি 'ফেসবুক'-এর মাধ্যমে ওই বাংলাদেশী মহিলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। কর্ণেল এখন 'কোর্ট অফ্ এনকোয়ারি'র সম্মুখীন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ— তিনি নিয়মিতভাবে ওই মক্ষিরাণী বাংলাদেশী মহিলার সঙ্গে 'ফেসবুক'-এর মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছিলেন, চ্যাটিংও করতেন।

সেনা-সূত্রে খবর, কর্নেলের ঘনিষ্ঠতা কেবলমাত্র ফেসবুক আদান- প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ওই মহিলা পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এরও এজেন্ট। ইতিপূর্বে ঢাকাতে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী অফিসারদের ক্ষেত্রে ওই মহিলাকে 'হানিট্র্যাপ' হিসেবেও ব্যবহার করেছে আই এস আই। এসব যে বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতসারে ঘটেনি, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদেশী গুপ্তচরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে লেফট্যানেন্ট কর্নেলকে ওই বাংলাদেশী মহিলা (আই এস আই এজেন্ট) সহ সম্প্রতি একটি হোটেল থেকে গত মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওই বাংলাদেশী মহিলার নাম সীবা। তাঁকে হানি-ট্র্যাপ হিসেবে ব্যবহার করে আই এস আই ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ওই অফিসারকে ব্ল্যাকমেল করেছে। তাকে পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে বারবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ঢাকায় এক পার্টিতে ওই মহিলার পরিচয় করানো হয়েছিল পূর্বপরিকল্পিত যোজনা অনুসারেই। ওই মহিলা ও ভারতীয় অফিসারের একত্র অবস্থানের ছবি তুলে কর্নেলকে পাক-গোয়েন্দারা সোজাসুজি ব্ল্যাকমেল করেছিল।

এমনকী ওই ভারতীয় অফিসার ভারতে চলে আসার পরও তার পিছু ছাড়েনি পাক-গোয়েন্দারা।

জার্মানিতে নিষিদ্ধ মুসলমান সংগঠন

সংবাদদাতা ॥ ইনকিলাব (Inquilab 16.6.12) পত্রিকার সূত্রে জানা যাচ্ছে সম্প্রতি জার্মান পুলিশ সালাফি (Salafi) মুসলমানদের বাড়িগুলি তল্লাসী করে। সরকারের বিরুদ্ধে সালাফি মুসলিমরা ষড়যন্ত্র করছে বলে জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। জার্মান সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের বক্তব্য, ওয়াহাবি সংগঠনের তিনজন কর্মীর বাড়ি তল্লাসী করা হয় এবং এজন্যে এক হাজারের বেশি পুলিশকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কতজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার হয়েছে সরকার অবশ্য তা জানায়নি। সালাফি মুসলিমদের পরিচালিত মিল্লাত ইব্রাহিম-কে (Millate Ibrahim) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জার্মানির সোলিজেন (Soligen) শহরে সালাফি মুসলিম ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সালাফিরা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল বলে সরকার অভিযোগ করছে।

অন্যদিকে সালাফিদের মুখপাত্র বলেছে, তারা ইসলামের প্রচার করছিল। বহু খৃস্টান তাদের প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করছে। একারণেই জার্মান পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ করেছে। জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর জেগার (Jaeger) অভিযোগ করেছেন, এইসব সংগঠন জার্মানিতে শরিয়ত আইন চালু করতে চাইছে। এরা সৌদি আরব থেকে মদত পাচ্ছে। সরকারের সূত্র মোতাবেক ওয়াহাবি ও সালাফিরা জার্মানিতে দাঙ্গা বাধাতে চাইছে এবং একারণেই এদের উপর কড়া নজরদারি চালাতে হচ্ছে। সম্প্রতি জার্মানির বন শহরে এক সমাবেশের সময় পুলিশ ও চরমপন্থী সালাফিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে। এতে ২৯ জন পুলিশ আহত হয়। এই সংঘর্ষে পুলিশ ১০৯ জন সালাফি চরমপন্থীকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের মুখপাত্রের অভিযোগ, এইসব চরমপন্থী মুসলমান সংগঠনগুলোর আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ঘোষণা— জার্মানিতে এইসব মুসলমানদের কাজকর্ম আমরা চালাতে দেব না।

১ শতাংশ বেকার নিয়ে গুজরাট দেশে সর্বনিম্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গুজরাট মুখ্যমন্ত্রীর হাসি আরও চওড়া হলো। বিশ্বজুড়ে মন্দার মধ্যেও গুজরাটে দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম বে-রোজগেরে মানুষ বাস করে— এই তথ্য উঠে এসেছে খোদ শ্রম দপ্তর রিপোর্ট থেকে। এই সংবাদ মোদীর কাছে আরও বেশি খুশীর, কারণ সেই রাজ্য আর কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচনে যেতে চলেছে।

ছত্তিশগড়স্থিত শ্রম দপ্তরের যে লেবারব্যুরো রয়েছে তারই দেওয়া ২০১১-১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, গুজরাটে মাত্র ১ শতাংশ বে-রোজগেরে মানুষ রয়েছে। অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষের গত আর্থিক বছরে এর গড় হলো ৩.৮ শতাংশ।

শ্রমদপ্তর দ্বারা প্রকাশিত রাজ্যওয়ারি বে-রোজগেরে পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

- গুজরাতে সবচেয়ে কম বেকার। মাত্র ১ শতাংশ।
- ছত্তিশগড়ে খুব খারাপ নয়। সেখানে বেকারের শতাংশ হলো ১.২ শতাংশ।
- কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল— দমন আর দিউতে এর শতাংশ হার মাত্র ০.৬ শতাংশ।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে এই হার মারাত্মক।
- ভারতের জাতীয় বেকার শতাংশের গড় হলো ৩.৪ শতাংশ।
- শহরাঞ্চলে বেকারত্ব গ্রামাঞ্চল থেকে বেশি।

সাংবাদিকদের প্রতি ক্ষুদে মন্ত্রীর উপদেশ

‘নেগেটিভ নয় পজিটিভ চিন্তা করুন’

মমতার মন্ত্রীসভার ক্ষুদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মহোদয়া সম্প্রতি সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে অতি মূল্যবান উপদেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। বিগত চার দশকের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় এমন সারগর্ভ কথামৃত আমি শুনিনি। ঘটনাটি আপনাদের সকলেরই জানা। একটি বাংলা টিভি সংবাদ চ্যানেলে কলকাতার সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এস এস কে এমে জনৈক সাফাই কর্মী রোগীর ক্ষতস্থানে সেলাই করছে এমন ছবি দেখানোর পর রাজ্যজুড়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। এতেই মন্ত্রী মহোদয়া ক্ষিপ্ত হয়ে সল্টলেকে স্বাস্থ্য ভবনে রীতিমত সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাংবাদিকতার ক্লাস নিয়েছেন। মন্ত্রীর উপদেশ, ভবিষ্যতে সরকারি দফতরের কাজকর্মে বড়সড় গাফিলতি বা বেনিয়ম দেখলে সাংবাদিকরা সর্ব প্রথম সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীকে জানাবেন। তাড়াহুড়ো না করে, ধৈর্য ধরে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য দু’ চারদিন অপেক্ষাও করতে হতে পারে। তবে কোনও অবস্থায় মন্ত্রীদের অজান্তে এবং বিনা অনুমতিতে সরকারি দফতরের গাফিলতি জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। সাংবাদিকদের শয়নে জাগরণে সদাসর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, মা-মাটি-মানুষের মাননীয় মন্ত্রীরা দিবারাত্র জনসেবায় কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। অতি তুচ্ছ দু’ একটি ঘটনা বড় করে দেখিয়ে সিপিএম-বিজেপি-র লাগাতার অপপ্রচারে নিজেদের যুক্ত করবেন না। মন্ত্রীদের বিনা অনুমতিতে সরকারি দফতরের গাফিলতি বা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ করা যাবে না। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের এই ক্ষুদে মন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করেছেন, সাংবাদিকরা কী পুলিশ না সি আই ডি? কোন অধিকারে সাংবাদিকরা সরকারি দফতরের দুর্নীতি, গাফিলতি, বেনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে গোপনে অনুসন্ধান করেন। সাংবাদিকদের তদন্ত করার অধিকার দিয়েছে কে? স্বাস্থ্য দফতরের বিনা অনুমতিতে সরকারি হাসপাতালের চত্বরে সংবাদ মাধ্যমের প্রবেশাধিকার থাকবে না। সরকারি হাসপাতালে সাফাই কর্মী নিজের কাজটা না করে চিকিৎসকদের সাদা অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে রোগীর ক্ষতস্থান সেলাই করছে কীনা তা দেখার দায়িত্ব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। সংবাদমাধ্যমের নয়। যেমন, অধিকাংশ জেলা সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগ এবং জরুরী বিভাগে ডাক্তারবাবুদের অতি পরিচিত ঘরের লোকরা রোগীদের ছোটখাট রোগের চিকিৎসা করে। সংবাদ মাধ্যম এমন সব কাজের লোকেদের ‘বহিরাগত’ বলে হৈচৈ করছে। ক্ষুদে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর মতে এটি সাংবাদিকতার নীতি বিরোধী। সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এই স্তম্ভের কাজ বাকি

গূঢ়পুরুষের

কলম

তিনটি স্তম্ভের (আইন, বিচার, প্রশাসন) মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা। সমালোচনা করা নয়। রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য মা-মাটি-মানুষের সরকারের ভাল ভাল কাজকে জনগণের সামনে তুলে ধরা। এমনটি না করলে বাম বিরোধী মানুষই উচিত শিক্ষা দেবে।

স্বাস্থ্য ভবনে ক্ষুদে মন্ত্রীর ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের কয়েকজন বলার চেষ্টা করেন, সাংবাদিকরা সরকারি কর্মচারী নন। তাই সরকারি দফতরের গাফিলতি, বেনিয়মের ঘটনা মন্ত্রীকে বা দফতর সচিবকেই জানাতে হবে, জনসমক্ষে তুলে ধরা যাবে না এমন মুচলেকা সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারকে দিতে বাধ্য নন। সাংবাদিকরা সাধারণ মানুষের কাছে, সংবাদপত্রের পাঠকদের কাছে বা চ্যানেলের দর্শকদের কাছে দায়বদ্ধ। কোনও রাজনৈতিক দল বা সরকারের কাছে দায়বদ্ধ নন। বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট লেখার অধিকার স্বীকৃত। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি’ প্রকাশিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে সেখানে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটে। বিশ্বজুড়ে এমন হাজারো ঘটনা আছে যেখানে সাংবাদিকের তদন্তমূলক প্রতিবেদনের ঝড়ে উড়ে গেছে ক্ষমতাধর শাসকদের ঔদ্ধত্য। ভারতেও এমন ঘটনার অসংখ্য নজির আছে। সচেতন পাঠকদের সেসব ঘটনা অজানা নয়। পশ্চিমবঙ্গে শাসকের গদিতে বসে এখন যাঁরা সাংবাদিকদের দাবড়াচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন, দলের জল্লাদ বাহিনিকে লেলিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা ভুলে গেছেন, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, জঙ্গলমহলে সিপিএমের হিংস্র পাশবিক আক্রমণের ঘটনাবলী এই সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা অকুতোভয়ে দিনের পর দিন তুলে ধরেছিলেন। তখন এই ক্ষুদে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতো তৃণমূল নেতা নেত্রীরা জানতে চাননি, সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লিখিত অনুমতি নিয়ে নন্দীগ্রাম-নেতাইয়ের গণহত্যার লিখেছেন কিনা। কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ ক্ষুদে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, স্বাস্থ্য দফতর সরকারি হাসপাতালের গাফিলতি নিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ সংবাদ মাধ্যমকে দেয়নি। সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়াই সাংবাদিকরা হাসপাতালে ঢুকে পড়ছেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলছেন। হাসপাতালের ‘গ্রুপ ডি’ স্টাফ কেন রোগীদের ইসিজি, এক্স-রে, শব ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়মিত করবে কেন, এমন সব প্রশ্ন তুলছেন। ঘটনাবলী মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তাঁরা যে রাজ্যের উন্নয়নে ‘দিদির’ সঙ্গে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করছেন সেকথা সাংবাদিকরা লেখেন না। হায়!

আমাদের রাজ্যের ক্ষুদে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বোঝাবে কে ভাল কাজ করবেন এই আশায় মাত্র এক বছর আগে বাংলার মানুষ সিপিএম তাড়িয়ে তাঁদের দলকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে মহাকরণে বসিয়ে ছিল। এখন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মতো ক্ষুদে মন্ত্রীরাও চোখ রাঙাচ্ছেন, আমরা এত এত ভাল কাজ করছি, অথচ কেউ হাততালি দিচ্ছে না। কারণ, যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে সাংবাদিকরা। তারা লেখে না, প্রতিদিন কত শত রোগী সরকারি হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে বাড়ি ফিরছেন। ক্ষুদে মন্ত্রীর উপদেশ, ‘সাংবাদিকরা এখন থেকে নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করে পজিটিভ চিন্তা করুন।’ নতুবা...।

রাজ্য রাজনীতি

কেন্দ্র-মমতা সংঘাত চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে

নিশাকর সোম

সারাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন রাজনৈতিক বিন্যাস হতে চলেছে। তার প্রভাব এই রাজ্যের রাজনীতিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে নেমে আসছে। এতদিন মমতার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সাহায্য মঞ্জুর না করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছিলেন। ঠিক যেমন জ্যোতি বসুর আমলে বলা হোত— কাজ না হলে কেন্দ্রের দোষ, কাজ হলে জ্যোতি বোস। প্রতিশ্রুতির বন্যা টাকা মঞ্জুরীতে মুক্ত হস্ত মমতা। তবে ইমামভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা, মসজিদ তৈরি এবং বেলুড় মঠ প্রভৃতিকে কোটি টাকার সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। আবার অন্যদিকে বার্ধক্য ভাতা এবং নির্যাতিত স্বাধীনতা সংগ্রামী-রাজনৈতিক কর্মীদের ভাতা বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি দৈনিকের হুকুম মাফিক গোয়েন্দা-তদন্ত চলছে বলে শোনা যাচ্ছে।

ঠিক যখন মমতার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থ সাহায্য না করার অভিযোগ করছেন, তখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ কেন্দ্রের টাকা কাজে না-লাগানোর জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধের কথা বলেছেন। আরও আছে--- রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সিংহ চামড়াবৃত বেড়াল সংগঠন কো- অর্ডিনেশন কমিটির বক্তব্যে জানা যাচ্ছে যে এ জি বেঙ্গল ১৬ এপ্রিল এক রিপোর্টে বলেছে— রাজ্য সরকার তিন হাজার কোটি টাকার খরচের হিসেব দেয়নি। এমনকি, ৮৮৯৯৯টি লেনদেন-এর পেমেন্ট, বিল ভাউচার এবং টেন্ডার ছাড়াই করা হয়েছে। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কৃষি দফতর ৭৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, কৃষি বিপনন দফতর ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, অনগ্রসর উন্নয়ন দফতর ১৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, প্রাণী সম্পদ-উন্নয়ন দফতর ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং সমবায় দফতর ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার হিসাব দেয়নি।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সরকার সম্পর্কে এক নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া মমতা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ‘কাজের গতি আনার’ জন্য অফিসারদের নিয়ে যেসব সভা করেছেন তার ফলও ভাল হবে না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এইসব সভায় বিডিও, এসডিও-কেও সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁরই নির্দেশ মতো কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন। ফলে ডি এম-দের তিনি ঠুঁটো করেছেন। এও এক প্রশাসনিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।

পুলিশের মধ্যেও তাঁর কথাই শেষ কথা বলে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। দময়ন্তী সেন-কে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এখনও বহু আই এ এস এবং আই পি এস-কে ফোর্সড ওয়েটিং লিস্টে রাখা হয়েছে। এভাবে রাজ্য প্রশাসন কি চলে? কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক সাহায্য না করার বিরুদ্ধে জেহাদকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংঘাত-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী।

মজার ব্যাপার হলো--- এ রাজ্যে যে রাজ্যপালই আসেন তিনি নেত্রীর পক্ষে চলে যান কেন? সাংবিধানিকভাবে তো রাজ্যপালের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ্যের কাজকর্ম ‘ওয়াচ’ করার কথা।

মমতা একের পর এক কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়ন-এর ব্যাপারে মমতা বস্তুত এনডিএ-এর দিকে যেতে বাধ্যই হবেন। যদি রাজনৈতিক অস্তিত্ব রাখতে চান, উপরাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী নিয়েও তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামছেন।

ইউপিএ-এর সভায় মুকুল রায়কে পাঠিয়ে তিনি ইউপিএ-এর সভাকে বস্তুত গৌণ বলে দেখিয়েছিলেন— তিনি তখন উত্তরবঙ্গে ছবি আঁকছেন। ছবির ফ্রেম দু'দিকে দু'জন সিকিউরিটি ধরে আছে— টাওয়ারে উঠে ৪৫ মিনিট ধরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলেন। বিমল গুরুং তাঁকে ‘মা’ বলেছেন। কারণ তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এদিকে কিন্তু রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলাজনিত বহু ঘটনা ঘটছে। সুঁটিয়াতে প্রতিবাদী মঞ্চের কর্মী কলকাতার মিত্র বিদ্যালয়ের (মেন) শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসকে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা। সুটিয়ার জনসাধারণের কথা থেকে জানা যায় যে এক বছর আগে প্রতিবাদী মঞ্চের নাড়ুগোপাল পোদ্দারকেও হত্যা করা হয়েছিল। এক বছরের মধ্যেও হত্যাকারীর হদিশ পুলিশ করেনি।

সুটিয়ার অধিবাসীদের বক্তব্য— এইসব হত্যার পিছনে ‘বড়মাথা’ আছে। সুটিয়ার অধিবাসীদের অভিযোগ— সুশান্ত চৌধুরী ও বীরেশ্বর ঢালি অস্ত্রশস্ত্র জমায়েত করেছে। পুলিশ-প্রশাসন নিশ্চুপ। এদিকে নন্দীগ্রামের ঘটনায় সিবিআই বুদ্ধদেববাবু এবং লক্ষণ শেঠদের সম্পর্কে ক্লিন চিট দিলে তাদের রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব ডেকে পাঠিয়ে নাকি ধমক দিয়েছেন! আর নেত্রী বলেছেন, কেন্দ্র ও সিপিএমের মৈত্রীর ফল এটা।

তৃণমূল মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি বলেছেন কংগ্রেসের কোনও কর্মী নেই— শুধু কিছু নেতা আছে। এ কংগ্রেস কিছুই করতে পারবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ২১ জুলাই মমতা ব্যানার্জী রণভেরি বাজিয়ে দেবেন। চলবেন স্বাধীন-মুক্ত হিসাবে। ভবিষ্যতে এ-রাজ্যে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে মরবে উলুখাগড়া সাধারণ মানুষ।

উচ্চশিক্ষা বড়ই ব্রাত্য
অস্থায়ীরাই চালাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়

মাননীয় শ্রী ব্রাত্য বসু,
শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

স্যার,

আপনি অভিনেতা, নট, নাট্যকার, পরিচালক মহাশয় ইত্যাদি সম্বোধনে হয়তো খুশি হতেন কিন্তু অমনভাবে ডাকতে কুণ্ঠা হচ্ছে। আফটার অল আপনি হচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। মানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মাথা। একেবারে অ, আ, ক, খ প্রাইমারি থেকে কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব কিছু আপনার কথায় ওঠে আর বসে। আপনি অবশ্য যে কোনও কিছু করার বা বলার আগেই ইষ্টনামের মতো জপ করে নেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে'। কিন্তু আমি এবং আমরা এই রাজ্যের মানুষেরা জানি আসলে আপনিই সব ঠিক করেন। গোটা শিক্ষা নামক মঞ্চটাই আপনার একক অভিনয়ের জায়গা। বাকি সব্বাই গৌণ। তাই আপনার কাছেই শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটা 'রুদ্ধসঙ্গীত' নিবেদন করতে চাই। দেখাতে চাই উচ্চশিক্ষায় কত 'কৃষ্ণ গহ্বর' তৈরি হয়েছে।

আপনি অনেকদিন আগে একটা নাটক লিখে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। সংস্কৃতি নাট্য গোষ্ঠী সেই 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' বামেদের কুনজরেও পড়েছিল। সেখানে এক কট্টর বাম মনস্ক মানুষ দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর তার ঘুম ভাঙার সময় থেকেই নাটকের শুরু। হঠাৎ করে তিনি আবিষ্কার করলেন সব কিছু বদলে গেছে। কিন্তু তিনি পড়ে আছেন সেই ঘুমিয়ে পড়ার সময়টায়। অস্থির হয়ে ওঠা মানুষটা দেখেও বিশ্বাস করতে পারেননি রতন টাটাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই একসময় স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নেতা হিসেবে বুর্জোয়া শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেন। গোটা নাটকের গল্প এখানে বলার জায়গা নয়। কিন্তু উত্থাপনটা করতেই হলো। কারণ, এখন যদি ওই প্লট নিয়ে কেউ নাটক লেখেন তবে দীর্ঘ সময় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে না মূল চরিত্রকে। মাত্র একটা বছর ঘুমিয়ে থাকলেই তিনি দেখবেন সব বদলে গেছে। একটা বছর আগের ব্রাত্য বসু নেই। এ যেন এক অন্য মানুষ। সেদিনের ব্রাত্যবাবুর কথাই আজ ব্রাত্য হয়ে গেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পিরিয়ডে দূরদর্শন কাঁপানো নেতা মন্ত্রী হয়ে মিউয়ে যাওয়া মুড়ির মতো হয়ে গেছেন।

জানি, মুখ্যমন্ত্রী এখন আপনার ওপর ভীষণ চটে। সেই যে আপনি শিক্ষকদের ধর্মঘটের অধিকার আছে বলেছিলেন তারপর থেকেই আপনি রাজ্য মন্ত্রিসভার 'বি-টিম'-এর সদস্য। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরে সঙ্গী হয়েও সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি হয়নি। এখনও দিদির কাছের টিভি চ্যানেলগুলিতে আপনার ছবি দেখানো নিয়ন্ত্রিত। উত্তরবঙ্গে শিক্ষার এত এত ঘোষণার মধ্যেও আপনি আড়ালে।

এসব ধান ভাঙতে শিবের গীতে কাজ নেই। সোজাসুজি চিঠির মূল বক্তব্যে আসা যাক। স্কুল শিক্ষার দায়িত্ব পরে পেলেও মন্ত্রিসভায় প্রথম দিন থেকেই আপনিই উচ্চশিক্ষার মাথা। আর সেই দিনগুলো এখনও মনে আছে এখনকার 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর প্রধান চরিত্রের। তখন আপনার কমিটি গড়ার পালা চলেছে। শিক্ষার মঞ্চ কাঁপিয়ে তখন এবেলা-ওবেলা আপনি কমিটি গড়তে লেগেছিলেন। সিলেবাস কমিটি আজও কল্পনা প্রসব করেনি। কিন্তু একের পর এক কল্পনার ভ্রূণের খবর মিলেছে। কমন সিলেবাস থেকে কমন ক্যালেন্ডার, কল্পনার শেষ নেই।

স্যার, আপনার সব থেকে বড় ঘোষণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গড়া হবে। সরকারি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমাপ্তি ঘটিয়ে সেই সার্চ কমিটিই সুপারিশ করবে শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বোচ্চ পদ উপাচার্যের নাম। সরকার সেই মতোই নিয়োগ করবে। কিন্তু হায়, সে আশা আর মেটেনি বাংলার। রাজ্যের ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বাদে সর্বত্রই এখন অস্থায়ী উপাচার্যরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোথাও একজন অস্থায়ীর পর দ্বিতীয় অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। এই তো যেমন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ষোড়শীমোহন দাঁকে সরিয়ে ক'দিন আগে ফের অস্থায়ীভাবে স্মৃতিকুমার সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সদ্য সদ্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার সুরঞ্জন দাস, যাদবপুরের অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং বিদ্যাসাগরের রঞ্জন চক্রবর্তী অস্থায়ী থেকে স্থায়ী হয়েছেন।

কল্যাণীতে আলোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী আছেন। কিন্তু বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যরা সকলেই গত এক বছর যাবৎ অস্থায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়	অস্থায়ী উপাচার্য
বর্ধমান	স্মৃতিকুমার সরকার
রবীন্দ্রভারতী	চিন্ময় গুহ
গৌড়বঙ্গ	অচিন্ত্য বিশ্বাস
সিধু কানহু বিরসা	শমিতা মান্না
প্রেসিডেন্সি	মালবিকা সরকার
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	শুভঙ্কর সরকার
বারাসত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়	কৌশিক গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগও সামনেই। সেখানেও অস্থায়ী নিয়োগই করতে হবে। কারণ, দু'জায়গাতেই সার্চ কমিটি গড়া হয়নি। আর নতুন সরকারের আমলে সংশোধিত আইন অনুসারে উপাচার্য রাজ্যপাল নন, নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। আর এখানেই স্যার ব্রাত্যবাবুর কাছে একগুচ্ছ প্রশ্ন, প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নিয়োগ কেন? আর তাঁদের বাছা হচ্ছে কোন নিরপেক্ষতা মেনে? সার্চ কমিটি গড়তেই বা এত দেরি কেন?

আপনি হয়তো বলবেন, এঁরা কেউই তৃণমূল কংগ্রেস করেন না। বিমান বসু, অনিল বিশ্বাসরাও বাম আমলে তাই বলতেন। আপনি কি তবে স্যার তাঁদের ভূমিকাতেই অভিনয় করছেন?

—সুন্দর মৌলিক

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আসন্ন বলেই তাঁর পদটা নিয়ে কিছু আলোচনা করাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের সংবিধান এই পদটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে, কিন্তু কিছু ত্রুটি ও অসঙ্গতি এক্ষেত্রে থেকে নিয়েছে। মনে হয়, সংবিধান সংশোধন করে সেগুলো দূর করা একান্তই দরকার।

আগেই বলেছি— পদটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে 'ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্ট'-এ তিনি ছিলেন তৃতীয় স্থানে, কারণ তাঁর আগে ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে— রাষ্ট্রপতির পরেই আছেন তিনি।

এটা লক্ষণীয় যে, গণপরিষদের সাংবিধানিক উপদেষ্টা স্যার বি.এন. রাউতের খসড়ায় উপ-রাষ্ট্রপতির কোনও স্থান ছিল না। তাঁর ছক অনুসারে রাষ্ট্রপতির আকস্মিক মৃত্যু, অনুপস্থিতি, পদচ্যুতি, অসুস্থতা ইত্যাদি ঘটলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সাংসদের দুই কক্ষের দুই সভাপতিকে নিয়ে গঠিত একটা সংস্থা তাঁর কাজ চালাবেন। কিন্তু পরবর্তী স্তরে এই পদ্ধতির জটিলতার কথা বুঝতে পেরে গণপরিষদ উপ-রাষ্ট্রপতির পদ তৈরি করেছে। সদস্যরা ধরে নিয়েছেন যে, এটাই বাস্তবসম্মত ব্যাপার, কারণ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর কর্তব্যপালনে অক্ষম হলে উপ- রাষ্ট্রপতিকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যাবে। এভাবে উপ-রাষ্ট্রপতি কোনও কোনও সময় হঠাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন। যদিও এমনিতে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা অত্যন্ত কম, কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে পদটির গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। সেই তুলনায় সংবিধান কিন্তু কিছু কিছু অসঙ্গতি রেখেছে— সেগুলো ঠিকঠাক করা দরকার।

প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্ণায়ক পদ্ধতির মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। ৫৪নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কিন্তু সংসদ ও বিধানসভাগুলোর নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন— সেই অর্থে তিনি জাতির প্রতিনিধি। উপরাষ্ট্রপতি কিন্তু নির্বাচিত হন শুধু সংসদের দুই কক্ষের সদস্যদের দ্বারা--- বিধায়কদের এই ব্যাপারে কোনও ভূমিকাই নেই। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, এর কারণ আছে। মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে উপ-রাষ্ট্রপতি সরাসরি রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত হন এবং পূর্বসূরীর কার্যকালের বাকি মেয়াদ পূর্ণ করেন। কিন্তু আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি সরাসরি এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি হন না— রাষ্ট্রপতির কার্যভার নেন মাত্র এবং নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সেভাবে কাজ করেন।

তবে ব্যাপারটা যেই রকমই হোক না কেন, আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি এই ধরনের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির স্থানেই অবস্থান করেন। এই কারণে বলা চলে— দুজনের নির্বাচন-পদ্ধতি একই ধরনের হওয়া উচিত ছিল। আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি অনুসারেই জাতির প্রতিনিধি— উপরাষ্ট্রপতির

> **রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্ণায়ক পদ্ধতির মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। ৫৪নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কিন্তু সংসদ ও বিধানসভাগুলোর নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন— সেই অর্থে তিনি জাতির প্রতিনিধি। উপরাষ্ট্রপতি কিন্তু নির্বাচিত হন শুধু সংসদের দুই কক্ষের সদস্যদের দ্বারা--- বিধায়কদের এই ব্যাপারে কোনও ভূমিকাই নেই।**

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন—২০১২

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে জাতীয় রাজনীতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ধার্য হয়েছে আগামী ৭ আগস্ট। প্রাপ্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিকে দ্বিতীয়বার ওই পদে প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেস দাঁড় করাতে চাইছে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, এইচ ডি দেবগৌড়া, প্রকাশ কারাত, মুলায়ম সিং যাদব, মায়াবতী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো এই ভোটে বিধায়কদের কোনও ভোট নেই। কেবল সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে ৭৯০ জনের ভোটাধিকার রয়েছে। অন্যদিকে উপরাষ্ট্রপতি পদে গোপালকৃষ্ণ গান্ধীকেই প্রার্থী করতে চায় তৃণমূল। এন ডি এ এখনও পর্যন্ত এই পদের জন্য কোনও প্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি। এন ডি এ-র বড় শরিক বিজেপি প্রয়োজনে বিরোধী দলগুলির প্রার্থীকেও সমর্থন করতে পারে বলে জানা গেছে।

কিন্তু সেই ধরনের সর্বভারতীয় পরিচয় নেই।

দ্বিতীয়ত, ৬৫ (১) ও ৬৫ (২) নং অনুচ্ছেদের মধ্যে একটা পার্থক্য রচনা করা হয়েছে, যদিও সেটা সুস্পষ্ট নয়। প্রথমটাতে বলা হয়েছে— মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রপতি-পদ শূন্য হলে উপ-রাষ্ট্রপতি সেটা পূরণ করবেন। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে আছে— কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর কর্তব্যপালনে অক্ষম হলে উপ-রাষ্ট্রপতি সাময়িক কালের জন্য তাঁর কাজ করে দেবেন।

অবশ্যই প্রথম বিষয়টা স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়টা তা নয়। রাষ্ট্রপতি কখন সাময়িক কালের জন্য কর্তব্যপালনে অক্ষম হবেন, সেটা কে নির্ধারণ করবেন? রাষ্ট্রপতি যদি গুরুতর অসুস্থ হন অথবা সেটা প্রকাশ না করেন, তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতি সেই সব প্রশাসনিক কাজ করার সুযোগই পাবেন না।

তৃতীয়ত, উপ-রাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রপতির কাজ করেন প্রথমোক্ত পদাধিকারীর মৃত্যু, অনুপস্থিতি, পদত্যাগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি কারণে, তাহলে তাঁর বেতন, ভাতা ইত্যাদি ঠিক করবে সংসদ এবং যতক্ষণ সেটা নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণ সেটা সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীল দ্বারা ঠিক হবে—(৬৫ (৩) নং অনুচ্ছেদ)।

কিন্তু এত কথার দরকারই ছিল না। সংবিধানে বলা উচিত ছিল— ওই সময়টাতে তিনি রাষ্ট্রপতিরই বেতন ও ভাতা পাবেন। তাহলেই বিষয়টা কিন্তু সহজ হোত।

চতুর্থত, আরও একটা বিষয় স্পষ্ট নয়। ৬৭ (খ) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উপ-রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে চায় এবং লোকসভা যদি তাতে সম্মতি দেয়, তাহলেই উপ-রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো— উপ-রাষ্ট্রপতি যদি রাষ্ট্রপতির কাজ করার সময় সংবিধান ভঙ্গের ('violation of the constitution') দায়ে অভিযুক্ত হন, তাহলে কি এই পদ্ধতিতেই তাঁর বিচার হবে, নাকি রাষ্ট্রপতির মতো 'ইমপীচমেন্ট' করতে হবে? রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এই অপরাধে কিন্তু ইম্পীচ কথার কথা— অর্থাৎ উভয় কক্ষেই উপস্থিতিদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং প্রত্যেক কক্ষের অন্তত অর্ধেকের বেশি সদস্যের গরিষ্ঠতা দরকার। আমাদের সংবিধান কিন্তু এই ব্যাপারটাও স্পষ্ট করেনি।

পঞ্চমত, উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতিটা বেশ সরল। রাজ্যসভা সেটা গ্রহণ করলে এবং লোকসভা সম্মতি দিলেই একজন সৎ ও কর্মক্ষম উপ-রাষ্ট্রপতি বিদায় নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু ৬১ নং অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে ইমপীচমেন্টের ব্যবস্থা রেখেছে। পদ্ধতিটা বেশ জটিল— সেটা এত জটিল যে কার্যক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করাটা দুস্কর হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে ডঃ কে ভি রাও এটাকে 'cumbersome and in effective' বলে অভিহিত করেছেন। আসলে, সংসদের একটা কক্ষে যদি রাষ্ট্রপতির পক্ষে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সাংসদ থাকেন, তাহলেই প্রয়াসটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ডঃ এম ভি পাইলী তাই মন্তব্য করেছেন, '...there is one area, however narrow, where he is his own master and is neither bound by the advise of the council nor runs the risk of successful impeachment against him।' মনে রাখতে হবে, ইম্পীচ্‌মেন্টের ব্যাপারটা নেওয়া হয়েছে মার্কিন সংবিধান থেকে। কিন্তু সেই দেশে আজ পর্যন্ত কোনও রাষ্ট্রপতিকে ইমপীচ করা যায়নি। এই কারণে সেখানে অনুচ্ছেদেটাকে মরচেধরা গাদাবন্দুক বা 'rusted blunderbass' বলা হয়েছে। এই সব কারণে মনে হয়--- উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ক্ষেত্রেও কিছুটা জটিল পদ্ধতি রাখা দরকার ছিল।

উপরাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক পিরামিডের দ্বিতীয় ব্যক্তি— অথচ তাঁর কোনও নিজস্ব প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। আসলে, তাঁকে দেওয়া হয়েছে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করার কাজ। কিন্তু সেটা আইনপ্রণয়ন বিভাগের দায়িত্ব— শাসনসংক্রান্ত নয়। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রশাসনের দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশাসনসম্পর্কিত কোনও নিজস্ব ক্ষমতা নেই।

সব শেষে বলা যায়— উপরাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক পিরামিডের দ্বিতীয় ব্যক্তি— অথচ তাঁর কোনও নিজস্ব প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। আসলে, তাঁকে দেওয়া হয়েছে রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করার কাজ। কিন্তু সেটা আইনপ্রণয়ন বিভাগের দায়িত্ব--- শাসনসংক্রান্ত নয়। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রশাসনের দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশাসনসম্পর্কিত কোনও নিজস্ব ক্ষমতা নেই।

অবশ্য উপ-রাষ্ট্রপতিকে খুব বেশি ক্ষমতা দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা বৃটিশ ধাঁচের ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করার রাষ্ট্রপতিই প্রায় নামমাত্র শাসকে পরিণত হয়েছেন বলে রাম জবায়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব, সম্‌শের বনাম পাঞ্জাব, সঞ্জীবি বনাম মাদ্রাজ প্রভৃতি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে। এই অবস্থায় উপরাষ্ট্রপতিকে তেমন করে ক্ষমতাবান করে তোলা কঠিন। কিন্তু সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দ্বিতীয়-প্রধান ব্যক্তি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকবেন— এটাও কাম্য নয়।

ডঃ বি সি রাউত জানিয়েছেন--- উপ-রাষ্ট্রপতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তাছাড়া তাঁকে বিভিন্ন সৌজন্য-মিশনে বিদেশেও পাঠানো হয়। কিন্তু সেগুলো বড় কথা নয়। তিনি অনেকটা দলের দ্বাদশ ব্যক্তির মতো— কখন তাঁর ডাক পড়বে— কেউ জানে না।

আমেরিকায় জন্ কেনেডি, লিন্ডন্ জন্সন্ প্রমুখ রাষ্ট্রপতি তাঁদের আমলে উপ-রাষ্ট্রপতিকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের ক্যাবিনেট-বৈঠকেও ডাকা হোত। সেই পদ্ধতিতে বা লিখিতভাবে উপ-রাষ্ট্রপতিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা, সেটা দেখা দরকার।

ডঃ হরিহর দাস মন্তব্য করেছেন—'On the pattern of the constitution of the USA, the Indian constitution also provides for the vice-president।' কিন্তু আমেরিকায় উপ-রাষ্ট্রপতিকে যে মর্যাদা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আমাদের উপরাষ্ট্রপতির নেই। এই বিষয়ে আমাদের সংবিধানের কিছু সংশোধন দরকার।

দ্বিজেন্দ্রগীতি প্রসঙ্গে

বিকাশ ভট্টাচার্য

বাংলাগানের বিশেষত কাব্যসঙ্গীতের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু বাংলা কাব্যসঙ্গীত আরও যাঁদের অবদানে পুষ্ট, তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা কাব্যসঙ্গীত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে অনেকটাই নাটকের মাধ্যমে। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে একথাটা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধুমাত্র গীতিকারই নন, দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতে তাঁর অধিকার ছিল অপরিমেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত সব গান নাটক থেকে এসেছে।

'সাজাহান' (১৯০৯) নাটকে দেখি, রাজপুত বীরেরা যখন স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে রাজভক্ত প্রজা হবার চেষ্টা করে তখন মহামায়া জাতির অন্তরে বীরধর্ম এবং স্বাধীনতার আদর্শকে জাগিয়ে তোলেন গানে গানে। সমকালীন স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিকল্পনায় সংলাপের পরিপূরক হিসেবে ধ্বনিত হয়েছে চারণ বালকদের গান :

ধন-ধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।...

'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে (১৯০৫) পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গী গায়কদের রণগীতিটি উদ্দীপনা জাগায় সমকালের পটভূমিতেও। গানের সুরের মধ্যেও আছে অভিনবত্ব। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যাঁরা দ্বিজেন্দ্রগীতি করেন, তাঁরা গানটি তেমন গান না। এমনকি সুনির্বাচিত দ্বিজেন্দ্রগীতির স্বরলিপির বইতেও গানটি নেই। গানটি :

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয় গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া, যখন বিপন্না জননী-জায়া?
সাজ-সাজ সকলে রণসাজে শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে।
চল সমরে দিব জীবন ঢালি।
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।...

'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকে, ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকদলের গান নাট্য মুহূর্তে গড়ে তুলতে যেমন সার্থক, তেমনি সমকালীন ভারতের অবস্থাও দর্শকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

গানটি :

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী গর্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী ভেদি যে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ মা, ওঠ মা, দেখ মা চাহি
এই তো এসেছি আর চিন্তা নাহি
জননীহীনা কন্যাদীনা ওঠ মা, ওঠ মা প্রদীপটি ধর।...

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে দেশমাতৃকার বন্দনা, জন্মভূমির মহিমা ঘোষিত। দেশবাসীর সামনে অতীত গরিমা (ভারত আমার ভারত আমার...), গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরে জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে এই গানগুলির প্রভাব অপরিসীম। তাঁর চোখে ভারত 'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র' রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর গানে স্বদেশ প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে বীর্যভাব মিশ্রিত হয়েছে। বিলিতি গানের সুর ও ঢং অতি সুন্দর ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। আমরা জানি বিদেশে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বনামধন্য পুত্র দিলীপকুমার লিখেছেন,

“দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সঙ্গীত থেকে আহরণ করেছিলেন এই দীপ্তির জৌলুষ ওরফে প্রাণশক্তি— সংস্কৃত পরিভাষায় যার নাম ওজস্। আমার মনে হয় যাঁরাই আমাদের ইদানীন্তন সুরকারদের সুর মন দিয়ে শুনেছেন তাঁদেরই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সুর— কারুর ওজঃসম্পদ বা তাঁর কাব্যসম্পদের সঙ্গে জুড়ি হাঁকিয়েছে তাঁর সব বলিষ্ঠ গানেই, যথা : ‘বঙ্গ আমার, জননী আমার’, ‘মেবার পাহাড়’, ‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে’ প্রভৃতি।... দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে বৈদেশিক প্রাণশক্তির নিবিড়তার রসদ্যুতি আবাহন করে ভারতীয় আত্মিক সুরের সঙ্গে বৈদেশিকী ওজঃশক্তির সমন্বয়ে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছিলেন— যার ফলে শুধু তাঁর সুরের নানা বৈদেশিকী চলাফেরাকে অচেনা মনে হয় না।”

‘কোরাস’ বা সমবেত কণ্ঠে বাংলা গানের আধুনিক রীতিও দ্বিজেন্দ্রলালই প্রবর্তন করেন। গানের এক একটি স্তবকের পর গানের অংশবিশেষ সমবেত কণ্ঠে বারবার গীত হলে তার ভাবাদর্শ সহজেই গায়ক ও শ্রোতাকে আবিষ্ট করে। এই নতুন ভঙ্গীর স্রষ্টা হিসেবে এবং কোরাসের অপরাজেয় শিল্পী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

শুধু বিদেশী সুর নিয়েই যে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকজ সুরও তার গানে অপূর্ব এক ভাবের সৃষ্টি করেছে। যেমন, বাউল সুরে একতালা গান :

একবার গালভরা মা ডাকে
মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক মাকে।।

তাঁর গানে বিভিন্ন রাগের অপূর্ব প্রয়োগ উল্লেখ করার মতো। যেমন, ‘আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে’ (খাম্বাজ), ‘আইল ঋতুরাজ সজনী জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী’ (সিন্ধুরা), ‘ঐ প্রণয় উচ্ছাসি’ মধুর সম্ভাষি’ যমুনায় বাঁশী বাজে’ (ভৈরো, মিশ্র), ‘প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে’ (জয় জয়ন্তী), ‘হৃদয় আমার গোপন ক'রে আর তো লো সই রইতে নারি’ (ছায়নট) ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গান সেই সময় মঞ্চে গেয়ে মাতিয়ে দিতেন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। সেই বহুর মধ্যে একটি গানের উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। গানটি : ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকের ‘ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে’।

সবশেষে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘হাসির গান’-এর কথা উল্লেখ করে ইতি টানি। তিনি বহু হাসির গান লিখেছিলেন। জনপ্রিয়ও হয়েছিল বেশকিছু। কয়েকটি গান :

‘তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না future-এর চিন্তা, থাকে নাকে Shame
তারেই বলে প্রেম।...

‘নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো,
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটো।...।

‘আমি একটা উচ্ছ কবি, এমনই ধারা উচ্চ যে—
শেলি, ভিক্টর, হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।...’

‘আমরা বিলেত ফের্তা ক ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।...’ ▯

নেত্রদান মহাদান

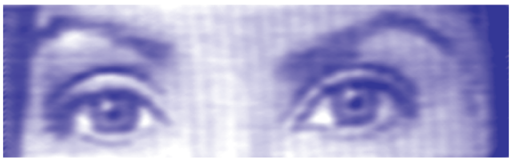

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

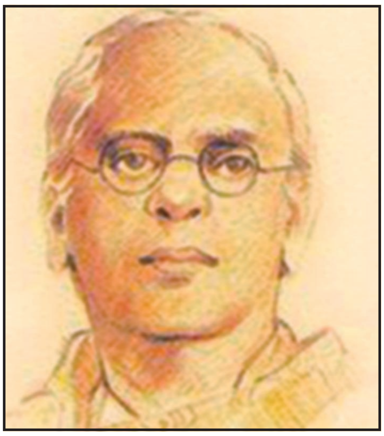

তুমি যে হে প্রাণের বঁধূ

অর্ণব নাগ

গ্রাম্য পথ। সেই পথ ধরে হেঁটে চলেছেন দুই যুবক। নেহাতই শহুরে তাঁরা। এঁদের মধ্যে একজনের আবার মাঝেমধ্যে দাঁত খোঁটার অভ্যেস রয়েছে। পল্লী পথের শোভা উপভোগ করতে করতে তিনি পথের ধারে একটি জরাজীর্ণ কুটীরের চাল থেকে দাঁত খোঁটার জন্য একটা খড় টেনে নিলেন। নিতান্তই সামান্য একটা খড়। কতটুকুই বা দাম হতে পারে তার? যুবকটি গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু বাড়ির মালকিন এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে যুবকটিকে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বকাবকি করতে লাগল। যুবকটির মনে হলো, নেহাতই খিটকেল বুড়ি। তাই দাঁড়িয়ে পড়ে একপ্রকার মজাই দেখছিলেন তিনি। কিন্তু বৃদ্ধাটি বলতে লাগলেন, "এ যে আমার ঘর, এ যে আমার একমাত্র সম্বল, এখানেই যে আমি মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছি। ওগো, আমার আর যে কিছু নাই, কোনও উপায় নাই, এটুকু গেলেই যে আমার সব যায়।" সহসা থমকে গেলেন যুবকটি। বৃদ্ধার করুণতম অবস্থা তাঁকে ব্যথিত করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর বেদনার জায়গাটা ছিল আরও গভীর। পাশের বন্ধুটিকে সেই যুবকটি বলেছিলেন, "আহা! এই অসহায়া বৃদ্ধা ছোট্ট এই কুড়েঘরখানিকে যেমনভাবে নিজস্ব, আপনার সর্বস্ব বলে জেনেছে, আমরা যদি এই ভারতবর্ষকে ঠিক তেমনই ধারা অন্তরের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব বলে বুঝতে পারতাম তবে আর ভাবনা কি ছিল! হায়, তা পারলাম না,— এই বড় দুঃখ।" এই যুবকটির নামই ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ওরফে ডি এল রায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান মাত্র দেড় বছরের। ঠাকুরবাড়ির মতো মানে-সম্মানে খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান না করলেও বংশমর্যাদায় দ্বিজেন্দ্রলাল খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান এবং 'ক্ষিতীশবংশাবলী রচিত'-এর রচয়িতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন তাঁর পিতৃদেব। সেকালের বনেদী পরিবারের রীতি-নীতি মেনেই যৌবনারম্ভে উচ্চশিক্ষার্থে চলে যান বিলেতে। এক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, উচ্চশিক্ষার শেষে দেশে ফেরার পরই বৃটিশ সরকারের চাকরি এবং রাজভক্তির নমুনা হিসেবে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের পালা চলে। উনিশ শতকের শেষ পর্বে হাতে গোনা যে কয়জন এর ব্যতিক্রমী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, ডি এল রায় তাঁদেরই একজন। ১৮৮৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি সরকার বাহাদুরের অধীনে সামান্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নেন। যদিও পরবর্তীকালে ডি এল রায়ের সত্যবাদিতা বৃটিশ রাজশক্তির মাথাব্যাথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্গের সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের খরদৃপ্তির আঁচ সেই সময়ই অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু স্বল্পায়ু দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯.০৭.১৮৬৩ - ১৭.০৫.১৯১৩) সমকালীন যুগেই তাঁর নিজস্ব ভাষাশৈলী সৃষ্টি করে (দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর কথায়--- আপন ভাষাপথ খনন করে) বঙ্গসংস্কৃতিকে মলয় বাতাসে ভাসিয়ে বঙ্গমানসে কুসুমের মতো পান করিয়েছেন।

এই দ্বিজেন্দ্র ভাষা-শৈলীর প্রথম আবির্ভাব দেখা যায় তাঁর রচিত 'হাসির গানে'। এ প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন সমকালীন যুগের একাধারে সাহিত্যিক, অন্যদিকে সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, "যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন, তখন বাঙ্গলায় ভাব-অস্থিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নব্য হিন্দু কেবল 'আর্য্যামির' আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামী'র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেইসময় দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের হিউমার বা ব্যাঙ্গের এদেশে আমদানি করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। যে গান বাঙ্গলা ভাষায় যেমন অপূর্ব, সে গানের সুর ও গীতপদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গাহিতেও তিনি স্বয়ং তেমনি অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্যন্ত, দার্জিলিং হইতে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত— বাঙ্গলার সকল জেলায় সকল সমাজে তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন অম্লমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। ... ব্রাহ্ম, থিওসফিস্ট, নব্য হিন্দু বিলাত ফেরতা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশ-হিতৈষী রাজনীতিক আন্দোলনকারী, বাবু, পণ্ডিত, হাকিম— বাংলার সকল শ্রেণীর সকল রকম 'ন্যাকা' ও ভণ্ড কবির তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন— তবু কেহই তাহার প্রতি রূঢ় নন, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। ... দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল।" (সাহিত্য, আষাঢ় সংখ্যা, ১৩২০)

অবশ্য এই হাসির গান অনেককেই অনভিপ্রেত আঘাত করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল একটা সময়। বিশেষ করে তাঁর প্যারোডি কোনও কোনও সময় শালীনতার গণ্ডী ছাড়িয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টালমাটাল পরিস্থিতিও দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু যে প্রতিভার স্বাক্ষর বঙ্গ সংস্কৃতিতে রেখেছিলেন ডি এল রায় তা আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে দ্বিজেন্দ্র-নাটক কিংবা দ্বিজেন্দ্র-গানে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে তাঁর বিখ্যাত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠক সাধারণের

নিকট পরিচিত ছিলেন না, তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটেই আসল কথা এবং এইটেই মনে রাখিবার যোগ্য।"

যৌবনের উত্তাল তরঙ্গের মাঝেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে নেমে এল সাংসারিক বিপর্যয়। ১৯০৩ সালের ২৯ নভেম্বর মারা গেলেন দ্বিজেন্দ্রপত্নী সুরবালা। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরে তখন একটি শিশুপুত্র ও একটি শিশুকন্যা। বঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশেও তখন স্বদেশীর পটভূমি প্রস্তুত হচ্ছে। আর বছর খানেকের মধ্যেই লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-কে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুখর হবে সারা বাংলা। কার্জনকৃত বঙ্গভঙ্গের যে সর্বাত্মক বিরোধী ছিলেন না ডি এল রায় একথা সত্য। কিন্তু তার মূলেও নিহিত ছিল স্বদেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। ১৯০৬ সালের ৯ জুন মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা থেকে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মনস্কামনা ব্যক্ত করেছিলেন, "বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, পার্টিশনে তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পূর্বে, তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।" তবে একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) -কে কেন্দ্র করেই তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের স্ফূরণ এসেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি অপূর্ব চিত্র ভাবীকালের পাঠকদের জন্য রেখে গিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রসুহৃদ দেবকুমার রায়চৌধুরী, "সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 'হরেক' রকমে, 'নানান' বেশে, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ 'ঢঙে' কত সব বিপুল আয়োজন সহকারে কলিকাতার ইতর-ভদ্র, সংখ্যাতীত, উন্মত্ত জনসংঘ মনমাতানো স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে, শহরময় পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত; আর এই নয়নরঞ্জন মনঃপ্রাণ-মোহন, অপূর্ব শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখিয়া দেশপ্রাণ কবি (দ্বিজেন্দ্রলাল) আমাদের তখন আপন উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কখনও এতটুকু বালকের মতো 'আহ্লাদে আট্‌খানা' হইয়া, ছুটিয়া আসিয়া স্বজন-বন্ধুদের জড়াইয়া ধরিতেন; কখনও উৎসাহভরে, উচ্চকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া আনন্দে হাতে তালি দিতে দিতে ওইসব সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিতেন। আবার কখনও বা বাষ্পসিক্ত লোচনযুগল উর্ধ্বপানে উন্মুক্ত করিয়া, প্রেমাকুল প্রাণে 'মা, মা' বলিয়া, যথার্থই যেন কাহার অপার্থিব ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন। এসব অবস্থায় তাঁহার সেই হর্ষোজ্জ্বল, রক্তিম মুখে কিংবা উল্লাস-বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে এক জ্বলন্ত জ্যোতিপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতে থাকিত— না দেখিয়া, আজ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অনুমান কি কল্পনা করিতে পারে।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাক-পটভূমিতে দেবকুমার রায়চৌধুরীকে কলকাতায় বসে ১৯০৪ সালের ৭ নভেম্বর (মাসের নাম যদিও অস্পষ্ট, সম্ভবত নভেম্বর) দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা পত্রে বোঝা যায়, স্বদেশী অনুরাগ কবির মনতটে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। সেই পত্রে ডি এল রায় লিখেছিলেন, "আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি, বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কী অপূর্ব অমৃতের আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল, প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল! এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই!" ওই চিঠিতেই দেখা যায় দেশমাতৃকার মধ্যে মাতৃমূর্তির উন্মেষ দ্বিজেন্দ্রলালের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি লিখেছেন, "মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলংকৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি প্রেম-কুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রাসাদে ডুবিয়া থাকিব, — আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি! সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে; আর যার তা না হয় সে হতভাগ্য, কুলাঙ্গার, নরাধম! ... স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমার মাকে 'মা' বলিয়াই পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মা-র দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই তো ভয় হয়— বুঝিবা আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে; তবেই তো ভয় — হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়— এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী।"

দেশমাতৃকার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের এই তীব্র ব্যাকুলতাই ফুটে উঠেছে তাঁর 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানের 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ; সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ' কিংবা 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ, দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার, আমার দেশ'-এর মতো অনন্যসাধারণ পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে। তাঁর সমকালীন নাটকে ও গানে দেশপ্রেমের এই আকুতিই পরিলক্ষিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই শুধু নয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত দ্বিজেন্দ্রগীতিরও নমুনা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেই সময়েই তিনি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যেগুলো আত্মীয়-বন্ধুদের পরামর্শে তিনি ভস্মীভূত করে ফেলেন রচনার অল্পকাল পরেই। আত্মীয়-বন্ধুদের ধারণা ছিল এইসব স্বদেশী সঙ্গীতের জন্য বৃটিশ রাজশক্তির কোপে পড়তেও পারেন তিনি। নিতান্তই বালক পুত্র দিলীপ ও শিশুকন্যা মায়ার মুখ চেয়ে ডি এল রায় আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ মেনে নিলেও সেই ভস্মাবশেষের দিকে তাকিয়ে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, "দেখছ? কেমন জ্বলে যাচ্ছে, দেখছ? এ আগুন বাইরে যতটা জ্বলছে, তা কি দশগুণও অন্তত (বুকে হাত দিয়ে) এই— এখানে জ্বলছে না?"

দ্বিজেন্দ্রলালের মর্মবেদনা অনুভব না করার কোনও কারণ নেই। শুধু কর্মেই নয়, মর্মেও যে স্বদেশপ্রেমের ফল্গুধারা সতত প্রবহমান রাখা যায়, ডি এল রায় তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। এই স্বদেশহিতৈশী মানুষটির জন্মসার্ধশতবর্ষের ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর গানের সুরেই শ্রদ্ধা জানাই, "তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, আমরা তোমায় ভালবাসি। তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাইতো কাছে ছুটে আসি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাবলী

সঙ্গীত সমগ্র	**প্রকাশকাল**	রাণাপ্রতাপ সিংহ	১৯০৫	চিন্তা ও কল্পনা	
আর্য্যগাথা প্রথম খণ্ড	১৮৮২	দুর্গাদাস	১৯০৬	ইংরেজি ও হিন্দু সংগীত	১৯০৬
আর্য্যগাথা দ্বিতীয় খণ্ড	১৮৯৪	নুরজাহান	১৯০৬	জাতিভেদ	১৯০৭
কবিতা সমগ্র		মেবার-পতন	১৯০৮	নবীনচন্দ্র (কবি নবীনচন্দ্র	১৯০৮
দ্য লিরিকস অব্ ইন্ড	১৮৮৬	সাজাহান	১৯০৮	সেনের কর্মের ওপর	
মন্দ্র	১৯০২	চন্দ্রগুপ্ত	১৯১১	সমালোচনা)	
আলেখ্য	১৯০৭	**সামাজিক নাটক**		মানভিক্ষা	
ত্রিবেণী	১৯১২	পরপারে	১৯১১	উপমা	
প্রহসন		বঙ্গনারী	১৯১৬	গোরা	
কল্কী অবতার		**বিবিধ নাটক**		(রবীন্দ্রনাথে ‘গোরা’	
বিরহ	১৮৯৭	সোহরাব রুস্তম	১৯০৮	উপন্যাসের সমালোচনা)	১৯১০
ত্র্যহস্পর্শ	১৯০০	সিংহল বিজয়	১৯১৫	**দেশাত্মবোধক সঙ্গীত**	
প্রায়শ্চিত্ত	১৯০২	**বিভিন্ন রচনা**		ভারত আমার	
পুনর্জন্ম	১৯১১	বিলাতের পত্র	১৮৮৪-৮৫	বঙ্গ আমার জননী আমার	
আনন্দ বিদায়	১৯১২	বাংলার রঙ্গভূমি	১৮৯৫	ধন্য ধান্য পুষ্প ভরা	
পৌরাণিক নাটক		(থিয়েটার সম্পর্কে)		যেদিন সুনীল জলধি হইতে	
পাষাণী	১৯০০	খুকুমণির ছড়া	১৮৯৯	পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে	
সীতা	১৯০২	(যোগীন্দ্রনাথ সরকারের		**অন্যান্য সঙ্গীত**	
ভীষ্ম	১৯১৩	কবিতাগুচ্ছ ‘খুকুমণির		আজি গাও মহা গীত	
ঐতিহাসিক নাটক		ছড়া’র সমালোচনা)		এস প্রাণ সখা	
তারাবাঈ	১৯০৩	কালিদাস ও ভবভূতি		আমরা এমনি এসে ভেসে যাই	

With Best
Compliments from :

Ajay Goel

বইয়ের এজেন্ট চাই
নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ও ডিগ্রি কোর্ষের বই বিক্রয়ের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্লক ভিত্তিক এজেন্সি দিতে চাই।
সম্পূর্ণ পোষ্টাল ঠিকানা দিয়ে এস.এম.এস করুন ৯৮৩২০৪৩৫১৫ নম্বরে ।
বই - এস.রায় সম্পাদিত
“ লেটার মার্ক A+ ”

চিঠিপত্র

মক্কা : কিছু কথা

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ৩৯ সংখ্যায় মৃণাল হোড় মহাশয়ের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠির অবতারণা। লেখাটি সুন্দর হয়েছে। উনি যে সাহস দেখিয়েছেন সেজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

হজরত মহম্মদ-এর জন্মের পূর্বে মক্কা-মদিনা সহ ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা কোন ধর্মের ছিল তা জানা আবশ্যক। ইসলাম সৃষ্টির পূর্বে ওই অঞ্চলে হিন্দু ধর্মই ছিল।

ইতিহাসে পড়েছি হজরত মহম্মদ নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তিগুলোও নষ্ট করে ফেলেন।

বহু দেব-দেবীর মূর্তি ছিল একথা সঠিক। বর্তমানে কাবায় ওরা যে পুজো করেন তা আসলে 'মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ'। সেটাও নষ্ট করার চেষ্টা করেন, পারেন নাই। দৈব-বাণী অনুযায়ী শিবলিঙ্গকে পাথর দিয়ে ঢেকে মুসলিমদের এখানে 'হজ' করার নির্দেশ দেন স্বয়ং মহম্মদ। এটাও নির্দেশ— জীবনে অন্তত একবার মক্কা শরিফে হজ করতে হবে। মক্কা মন্দিরে মুসলমানরা নামাজ পড়ে না। হিন্দু আচার মেনে উপবাস থেকে মুণ্ডিত মস্তকে কাবার অন্দরে প্রবেশ করে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। যারা মস্তক মুণ্ডিত করেন না তারা মক্কা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন না। মুণ্ডিত মস্তক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, দূরদর্শনের কল্যাণে। হজ থেকে ফিরে এসে কোনও মুসলমানই আসল সত্যি কথাটা কাউকে বলেন না। বিয়ের পূর্বে মেয়েদের কপালে হিন্দু আচার অনুযায়ী সিঁদুর পরতে হয় (মাটিয়া সিঁদুর ব্যবহার করেন)।

জন্মলগ্ন থেকেই মিথ্যাচার, অনাচার, পরদ্রব্য অনুষ্ঠান, পরস্ত্রীহরণ, খুন ইত্যাদি কাজে ওরা সিদ্ধহস্ত। ওটাই ওদের মূল বাণী। বাংলাদেশের দূরদর্শনের চ্যানেলে একবার 'আল কোরানের বাণী প্রচার করতে দেখেছি। কোনও সাচ্চা মুসলমান কাফেরের কাছ থেকে (হিন্দু) কোনও সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন না, তার নিচেই আবার লিখছেন— যদি খুব বিপদে পড় তবে সাহায্য নিতে পার, তবেই বুঝুন কেমন দ্বিচারিতা এই ধর্মে! ইসলাম ধর্মে সত্যি কথা বলতে নেই। সত্য বলার ওদের সাহস নেই।

আপনি যাদের যাদের চিঠি দিয়েছেন ওরা কেউ আপনার চিঠির উত্তর দিবে না। কারণ, সত্যি কথা বললে 'চাচাতো ভাইয়েরা ক্ষেপিয়ে ১৯৪৬ এর দাঙ্গা শুরু করবে। দিদিকে চিঠি দিয়ে লাভ নেই। শুধু 'কলমা' পড়া বাকী! দিদি জেনেও সত্যি কথা বলবেন না কারণ, ভোট বড় বালাই। যদি ক্ষেপে গিয়ে দিদিকে ভোট না দেন?

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, আমরা সবাই জানি। যখন দেখি হজযাত্রীদের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, অপরদিকে 'গঙ্গাসাগর' তীর্থযাত্রীদের থেকে তীর্থকর আদায় করছেন, মানস সরোবর যেতে হলেও তীর্থকর দিতে হয়। এখন বুঝুন আমরা কোন 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে বাস করছি? মনে হয় ঔরঙ্গজেবের শাসনে বাস করছি। যখন হিন্দুদের নিকট থেকে 'জিজিয়া কর' বলে বেঁচে থাকার জন্য কর আদায় করা হোত।

এখানেও সেই 'জুজুর' ভয় যদি চাচা তো ভাইয়েরা রাগ করেন।

জনস্বার্থ মামলা করাই যায় 'ভতুর্কি' মুসলমানদের জন্য তুলে দেওয়ার জন্য। হজ করতে যতবার খুশি যাক নিজ ব্যয়ে, কারও মাথাব্যথা নেই। সারা বিশ্বের মুসলিমগণ মক্কার কাবা মন্দিরকেই ওদের ধর্মের সেরা উপাসনালয় হিসেবে মেনে আসছেন, তখন একা ভারতের পক্ষে বন্ধ করা কী সম্ভব? সম্ভব হলেও ভোট রাজনীতির কারণে তা বাস্তবে পরিণত করার সাহস কোনও রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হবেন না!

আমরা 'তাজমহল' উদ্ধার করতে পারি নাই। হিন্দুদের তৈরি হিন্দু মন্দির কিভাবে 'মমতাজের' কবরে পরিণত হল, যার নাম ছিল 'তেজোমহল'। দ্রঃ- **তাজমহল হিন্দুমন্দির**। লেখক : পি, এন, হক, ভাষান্তর : দীপক কুমার ভট্টাচার্য, প্রকাশক : অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ৩৬, কলেজ রো, কলকাতা-৯।

ইসলাম ধর্ম (ধর্মীয় মতবাদ) জন্মলগ্ন থেকেই অনাচার ধর্ম হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃত। মুসলিম বাদশাদের হারেমে বহু নারীকে রাখা হোত ইচ্ছামতো ভোগ করার জন্য। বাদশার মৃত্যুর পর ওইসব মহিলারা মুক্তি পেতেন না। বাদশার ছেলে বাদশা হয়ে হারেমের সমস্ত মহিলাদের ভোগ করতেন। অর্থাৎ পিতা-পুত্র একই মহিলাদের ভোগ করতেন। আপন বোন ছাড়া ইসলামে সব মেয়েদের বিয়ে করতে পারেন এরকম নির্দেশ অনুযায়ী। এরকম অসভ্যতা বিশ্বে আর অন্যত্র নেই।

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

পালাবদল—পরিবর্তন

দীর্ঘ বাম অপশাসনের অবসানে রাজ্যের সাধারণ মানুষ একটা স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন। ইতিমধ্যে বর্তমান রাজ্য সরকারের মেয়াদ একবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়কালে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কিন্তু খুব একটা সুখকর নয়। বহু চর্চিত মা মাটি মানুষের সরকারের ব্যর্থতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। অথচ তৃণমূল নেত্রী তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ৯০ শতাংশ কাজ নাকি হয়ে গিয়েছে। তাহলে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পূর্ণতা পাওয়া তো শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু একথার সত্যতা আছে কি? রাজ্যে কৃষি বা শিল্পে সরকারের তেমন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। শিক্ষাক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়নি। অর্থনৈতিক সমস্যায় রাজ্য জর্জরিত অবস্থায়। রাজ্যে তৃণমূলী সন্ত্রাস ক্রমবর্ধমান। সিঙ্গুর সমস্যার সমাধানের পথ তথৈবচ। রাজ্যে হাসপাতালগুলোর হাল অপরিবর্তনীয়। সর্বোপরি রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ঘটনা তো আছেই। এমতাবস্থায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় যদি ৯০ শতাংশ কাজ হয়ে থাকে তাহলে পরিবর্তনকামী মানুষের সঙ্গে তা বিশ্বাসঘাতকতা করার সামিল নয় কি? তাই এরাজ্যে পালাবদলের অর্থ শাসকদলের রাজনৈতিক রং-এর পরিবর্তন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এটা শাসনকার্যের প্রকৃত পরিবর্তন নয়। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা বিষয়ে অবশ্যই পরিবর্তন এনেছেন। রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য যেন প্রাণ আকুলি বিকুলি করে ওঠে বর্তমান তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর। তাই রাজ্যে ইমাম ভাতা প্রদান, উর্দুভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি সহ মুসলিমদের অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন কল্পতরু সেজে বসে আছেন। এই সংখ্যালঘু তোষণের ফলে রাজ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। সরকার পরিবর্তনে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে উন্নয়নের দিশা দেখাবেন এটাই বাস্তব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকলে তা মরীচিকা হওয়াও অবাস্তব নয়। তাই সিপিএম বিতাড়নে তৃণমূলের আগমনে যে আলোর দিশা রাজ্যবাসী দেখতে চেয়েছিলেন তা ব্যুমেরাং হয়ে না দাঁড়ায়। কলকাতাকে লন্ডন বানানো বা সোনার বাংলা গড়ার পরিকল্পনা তাহলে স্বপ্ন হিসেবেই থেকে যাবে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

'হিগস্ বোসন বনাম 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব'

বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াই চিরকালীন। ঈশ্বরবাদীরা বলেন যা সত্য তাই ধর্ম, বিজ্ঞানীরা বলেন যা পরীক্ষিত সত্য তাই বিজ্ঞান। ধার্মিকরা

আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অনুভব করেন, বিজ্ঞান তার বাস্তব অস্তিত্ব দেখতে চায়। পথ আলাদা লক্ষ্য এক; ধর্ম ব্রহ্ম তথা সৃষ্টিকে জানতে চায়, বিজ্ঞান উদ্‌ঘাটন করতে চায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে বিজ্ঞানে যার যুক্তি নেই।

আবার ধর্মও পারে না সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে। 'হিগস্ বোসন' কণার আবিষ্কার এই দুই মেরুকে উস্কে দিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিলো বিতর্কপ্রেমী মানুষের। বিশেষ করে মিডিয়া যখন তাকে 'ঈশ্বর কণা' নামে অভিহিত করেছে। প্রশ্ন জেগেছে আধ্যাত্মিক পুরুষরা কি তাহলে এই ঈশ্বরের কথাই বলেছেন? তবে 'বোসন' কণা আবিষ্কারে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না। অনেকে আবার বলেছেন তাতে কি সবজির দাম কমবে? একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞান বলছে বোসন কণা আছে, ঈশ্বরবাদীরা বলছেন ঈশ্বর আছেন। আমরা কিন্তু কিছুই দেখিনি, না ঈশ্বর না বোসন কণা। যা দেখার দেখেছেন বিজ্ঞানী ও যোগী আধ্যাত্মিক পুরুষরা। এবার কে কোনটা বিশ্বাস করবে সেটা তার আস্থার উপর নির্ভর করবে।

ধর্ম যা অনুভব করে বিজ্ঞান তা ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করে। ভারতের অনেক যোগী মহাপুরুষ ছিলেন যারা দাবী করেছিলেন— আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি। ধর্মই বলে ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুটোই হয়। তাহলে কি তারা সাকার ঈশ্বরকেই দর্শন করেছেন? কেউ কেউ এটাই বিশ্বাস করেছেন, আবার কেউ বলেছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। সাকার ঈশ্বর দর্শন হলে সেটা অবশ্যই ভারতের সনাতন ধর্মেই সম্ভব। 'হিগস বোসনের' ক্ষেত্রেও তাই, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন— এমন কোন কণা আছে যা অন্য কণাদের ভর জোগায়। এটাকে কেউ বিশ্বাস করে এগিয়েছেন।

অনেকে আবার স্টিফেন হকিং-এর মতো বাজি ধরে বলেছেন— 'পাওয়া যাবে না সেই কণা।' আসলে ভারত কিছু বললে পাশ্চাত্য অত সহজে স্বীকৃতি দিতে চায় না। ঈশ্বর ধারণার তুলনায় বোসন কণার ধারণা নবীন হলেও বিজ্ঞান আজ বলতে পারছে— 'আমি তো শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করলাম'। তেমনি ঈশ্বরবাদীরাও বলতেই পারেন— 'বাপু, প্রাচীন বলে কি আমাদের কোনও ভিত্তি নেই। আমি তো সাকার ঈশ্বর দর্শন করেছি।'

বিতর্ক চলবেই; ব্রহ্মাণ্ড যেমন তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, ধর্ম ও বিজ্ঞান যেভাবে নিজের মতো করে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের সন্ধান করে চলেছে।

—বিরাজনারায়ণ রায়, ছাত্র, সাংবাদিকতা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলকাতা।

ইমামদের ভাতা প্রত্যাখ্যান

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত এক ইমাম সম্মেলনে রাজ্যের প্রত্যেক ইমামকে মাসিক ২৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদানের ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন সম্মেলনে উপস্থিত অধিকাংশ ইমাম মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাকে হাততালি দিয়ে জানিয়েছিলেন স্বাগত। কিন্তু পরবর্তীকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম সরকারের দেওয়া সেই ভাতা করেছেন প্রত্যাখ্যান। ৩০ হাজার ইমামের মধ্যে মাত্র ১৬ হাজার ইমাম সরকারি দাক্ষিণ্য নিতে ওয়াকফ্ বোর্ডের কাছে আবেদন করেছেন। আবার যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁদের অনেকে নিচ্ছেন না ভাতা। আর এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সরকারের কপালে। কারণ মিঞা ভাইয়েরা মুখ ফেরালে তাদের কী গতি হবে! আগামী পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে মুসলিমদের খুশি করে তাঁদের ভোটে বড়সড় দাঁও মারতে তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঘোষণা করেছিলেন ইমাম ভাতার কথা। অনেকে বিশেষত তৃণমূলিরা সেই ঘোষণাকে বলেছিলেন 'মাস্টারস্ট্রোক'। কিন্তু ভাতা গ্রাহকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকায় তাঁরা ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করছেন, দেখাচ্ছেন নানা অজুহাত। তবে গ্রাহক সংখ্যা কমার কারণ হিসেবে ওয়াকফ্ বোর্ড যেসব কথা বলছে সেগুলি এরূপ :

(ক) শরিয়ত আইন অনুসারে, ইমামরা কোনও সরকারি ভাতা বা দাক্ষিণ্য গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তা সরকারি বেতনের শামিল। ইমামরা সরকারের বেতনভুক কর্মচারি বা চাকর হতেও পারেন না। কারণ তাঁরা কারও অনুগ্রহের পাত্র নন। (খ) ওয়াকফ্ বোর্ড ঘোষণা করেছে, ইমামভাতা পেতে হলে ইমামদের নিজ নিজ মসজিদের পঞ্জিকরণ করতে হবে। কিন্তু রাজ্যে মসজিদ রয়েছে লক্ষাধিক, যেগুলির অধিকাংশেরই নেই ওয়াকফ বোর্ডের পঞ্জিকরণ। অনেকের ধারণা, মসজিদগুলি একবার ওয়াকফ বোর্ডে পঞ্জিকৃত হয়ে গেলে সেগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে যেতে পারে। (গ) ইমামরা এখন মসজিদ কমিটির মারফত মাসে ২৫০০ টাকার চেয়ে অনেক বেশি টাকা উপার্জন করেন। ভাতা নিলে সেই উপার্জন কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। (ঘ) বেশকিছু ইসলামিক ধর্মগুরু বা মুফ্‌তি ইমামদের ভাতা প্রত্যাখ্যানের 'ফতোয়া' জারি করেছেন। সেই 'ফতোয়া' বহু ইমাম অমান্য করতে পারছেন না। তবে উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও রয়েছে আরও কিছু কারণ। যেমন : (ক) ইসলামের বিধান অনুসারে, সরকারি টাকার সঙ্গে মিশে থাকে কিছু সংস্থা (সিনেমা, বার, মদের দোকান, তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতির কারখানা প্রভৃতি)-র কাছ থেকে সংগৃহীত লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্সের টাকা, যা 'হারাম'। তাই যে টাকার সঙ্গে 'হারাম' টাকা মিশ্রিত তা গ্রহণ ইসলাম বিরোধী। ইসলামে সুদ 'হারাম' কিন্তু লভ্যাংশ 'হালাল'। (খ) বহু ইমাম চান না নিজেদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ইমামভাতা নিতে। তাঁরা চান না নিজেদের পিঠে তৃণমূলের ছাপ লাগাতে। কারণ মমতা চিরকাল ক্ষমতায় থাকবে না। (গ) ইমামদের মধ্যেও রয়েছেন বহু সিপিএম ও কংগ্রেস সমর্থক। তাই তাঁরা তৃণমূল তথা মমতা-সরকারের দেওয়া ভাতা নিতে অনিচ্ছুক। তাঁরাই দলে ভারী এখনও। (ঘ) ইমাম ভাতার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রথম শুনানির দিনই কোর্ট সরকারি কৌঁসুলীকে জানিয়ে দিয়েছে, মামলায় সরকারের হার হলে ভাতার টাকা সরকারকে ফেরৎ নিতে হবে।

একেই বলে 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'। মমতা ভোটের লোভে সংবিধান বিরোধী কাজ করে ফেঁসে যেতে বসেছেন। তিনি ভেবেছিলেন, ইমামদের তুষ্ট করলে মুসলিমরা তুষ্ট হবেন। ইমামদের নির্দেশে মুসলিমরা তৃণমূলকে ভোট দেবেন। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেই উঠেছে ইমাম ভাতার বিরোধিতা। তাঁদের প্রশ্ন, 'তেলা মাথায় তেল কেন? ইমামরা তো সচ্ছল। তাঁরা দেশ-বিদেশের নানা ইসলামিক সংগঠনের কাছ থেকেও অর্থ পান। তাই ইমাম ভাতার টাকা গরিব মুসলিম বাচ্চাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকার খরচ করলে, মুসলিম সমাজই হোত বেশি উপকৃত। অতঃপর মমতার ভাতাদান 'সুপারফ্লপ'!

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

বিলুপ্তির পথে কৃষি উৎসব : ঢেঁকি চুরি

নবকুমার ভট্টাচার্য

আগুন ঝরা আকাশে বৃষ্টির নাম নেই অথচ আষাঢ় মাসও শেষের পথে। লাঙল জোয়াল মাচায় তোলা। চাষির চোখে ঘুম নেই। বৃষ্টির অভাবে হাতে কোনও কাজ নেই। তখন এই ঢেঁকি চুরি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গ্রামে গ্রামে। সেকালে প্রতি বাড়িতেই উত্তরমুখে দক্ষিণমুখে আবার কোথাও কোথাও পূর্বমুখে চালাঘরে ঢেঁকি বসানো থাকতো। এই ঢেঁকি রাখার চালাঘরগুলি থাকতো গোলাঘরের কাছাকাছি। গ্রামীণ সংস্কার পূর্বমুখে বাসানো ঢেঁকি যদি গৃহস্বামীর অলক্ষ্যে চুরি করে নিয়ে গিয়ে গ্রামের বাইরের কোনও বড় পুকুরের ঈশান কোণে জলে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে সাতদিনের মধ্যে বৃষ্টি হবেই হবে। এই ঢেঁকিচুরি এককালে গ্রামীণ জীবনের এক কৌতুককর উৎসব ছিল। এই ঢেঁকি চুরি উৎসবের জন্য গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পরিকল্পনা করত প্রাচীনেরা, তার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ছোকরারা। সঙ, কীর্তন বের করা হোত নানান জাঁকজমক করে। গ্রামের রাস্তায় হৈহুল্লোড়। প্রতিটি বাড়ির ছেলে বুড়ো এমনকী বাড়ির বৌ, প্রাচীন গিন্নীরা যখন সদর রাস্তায় এসে দাঁড়াত, ঠিক সেই অবসরে গ্রামের ছেলে ছোকরারা নির্দিষ্ট বাড়ি থেকে পূর্বমুখী ঢেঁকি তুলে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দিত। পরে সাতদিনের মধ্যে বৃষ্টি আরম্ভ হলে পুকুর থেকে ঢেঁকি তুলে আনা হোত। কোনও কোনও বাড়িতে এইসঙ্গে হোত ইন্দ্র ও বরুণ দেবতার পুজো। নৈবেদ্য দেওয়া হোত চিড়ে দই।

বাংলার অনেক জেলায় বিশেষত বাঁকুড়া বীরভূমে ঢেঁকিচুরি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎসব। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে সারা আষাঢ় মাসে বৃষ্টি না হলে বাংলার চাষি মাথায় হাত দিয়ে বসে। কেননা কৃষি নির্ভর বাঙালির জীবনে বৃষ্টির একান্তই প্রয়োজন। বর্ষাকে ভরসা করেই কৃষিকাজ হয়ে থাকে। তাই বৃষ্টি না হলে বৈদিক কালের মতো যাগযজ্ঞ করার সামর্থ্য না থাকায় এই তুকতাক প্রক্রিয়ায় বর্ষাকে আহ্বান করা হয়। অবশ্য বর্ষা এলে ইন্দ্র ও বরুণ দেবতাকে খুশি করার জন্য পুজোপাঠও হয়ে থাকে। ঢেঁকি আদিরূপ শস্য পেষণ দণ্ড। পেষণের হাত থেকে শস্যকে অব্যাহতি দিয়ে শস্যের সম্ভাবনার জন্যই বর্ষার আহ্বান। মানুষের চিন্তা হলো প্রকৃতি ক্রুদ্ধ হলেই প্লাবন হয়, খরা হয়, বন্যা হয়। প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্যই সাধারণ গ্রামীণ মানুষের এই আচরণ অনুষ্ঠান।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বাংলার সমস্ত জেলায় ঢেঁকিচুরি অনুষ্ঠানে আনন্দের বান বয়ে যেত। আজ এই অনুষ্ঠান কেবল বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার কোনও কোনও অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঢেঁকি চুরিকে কেন্দ্র করে নানা ছড়া বানানো হোত। লোকমুখে এইসব ছড়া এখনও কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যায়। চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধেরা যেমন ঢেঁকি চুরির পরিকল্পনা করত তেমনি বাড়ির গিন্নির সন্দেহ আর বিশেষ পাহারায় বহু সময় ঢেঁকি চুরির পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যেত। ঢেঁকি চুরির পরিকল্পনা বানচাল হওয়ার পর সকালে একটা পুকুরের ঘাটে একটি বউকে অন্য পাড়ার এক বুড়ি জিজ্ঞাসা করছে— হ্যাঁলো বৌ! অত রাতে তোদের পাড়ায় কীসের হট্টগোল হচ্ছিল? উত্তরে বউটি বলছে—

চণ্ডীমণ্ডপের গুলজারি
সঙ সেজে হয় হুড়োহুড়ি
পা পাঁচ ছয় বেরিয়ে গেলে
হোত আমার ঢেঁকিচুরি।।

অন্য পাড়ার বুড়িটিও বাগাল মোড়লের বৌ এই মাধুরীকে চেনে। বুড়িকে বেশ কয়েকবার নাকাল করেছে এই বৌ। তাই প্রত্যুত্তরে সেও ছড়া কাটে—

বাগাল মোড়লের মাগ মাধুরী
সে থাকতে হয় কি ঢেঁকি চুরি।।

এই ঢেঁকি চুরি করা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ হাসাহাসির অন্ত থাকে না গ্রামজীবনে। সাতদিন দশদিন ধরে ছড়া কাটাকাটি হোত, ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া সহ কত হাস্যকৌতুক হোত এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ইন্দ্র বরুণ দেবতার পুজো উপলক্ষে কাঁচা শালপাতায় চিড়ে দই ভোজন করত সবাই। তারপর সাত দশদিনের মধ্যে মুষলধারায় বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই। আজ রাজনীতির অনুপ্রবেশে গ্রামীণ জীবনধারার উৎসমুখ শুকিয়ে গিয়েছে। গ্রামীণ জীবনে দলাদলি, মারামারি এইসব গ্রামীণ উৎসবকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ঢেঁকি চুরি উৎসব আজ তাই বিলুপ্তির পথে। □

পরমহংস নিগমানন্দ : ‘ফোর ইন ওয়ান’

কল্যাণ চক্রবর্তী

এই সংসার একটি রঙ্গমঞ্চ। এই সংসার রঙ্গমঞ্চে মাহেশ্বরী কার মধ্য দিয়ে যে কি নাটক মঞ্চস্থ করান, তা ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধির অগম্য। আজ এমনই একটি নাটকের দিব্য কাহিনী এখানে তুলে ধরব যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

নাটকের প্রধান চরিত্রে নাম — নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১২৮৭ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথি। জন্মস্থান : নদীয়া জেলার কুতবপুর। স্ত্রীর নাম — সুধাংশুবালা, আদুরে নাম রাণী।

সাল ১৩০৭। নলিনীকান্ত তখন সেটেলমেন্ট বিভাগে নারায়ণপুর ক্যাম্পে সুপারভাইসর পদে কর্মরত। স্ত্রী আছেন স্বামীগৃহ কুতবপুরে। একদিন গভীর রাতে নলিনীকান্ত ক্যাম্পের মধ্যে আপন কাজে মগ্ন আছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পান টেবিলের সামনে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা দৃশ্যে তিনি ভয়ে চিৎকার করে হতজ্ঞান হলেন। পরে জানা গেল, ওই ঘটনার ঠিক চার দণ্ড আগে তাঁর স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

এযাবৎ নলিনীকান্ত পরলোক পরকাল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু ওই ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। প্রেততত্ত্ব জানতে তিনি ছুটলেন মাদ্রাজের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে। সেখানে মিডিয়ামের মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হল এবং স্ত্রীর কণ্ঠে একটি গানও শুনলেন— যা ছিল তাঁর পূর্বশ্রুত। কিন্তু স্ত্রীকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে স্বামী পূর্ণানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। স্বামীজী সব শুনে বললেন, ‘জগতের সকল স্ত্রী-ই মহামায়ার ছায়ামাত্র। তুমি মহামায়ার সাধনা কর। তাহলে অচিরেই সব তোমার করায়ত্ব হবে। আমি তোমার গুরু নই। এর জন্য তুমি গুরুর সন্ধান কর।’

নলিনীকান্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো গুরু খুঁজতে গিয়ে এক রাতে স্বপ্নযোগে এক সৌম্যদর্শন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের মাধ্যমে বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লেখা একাক্ষরী মন্ত্র পেলেন। কিন্তু এই মন্ত্রের জপ কৌশল কোথাও গিয়ে বুঝতে না পেরে আত্মহত্যার সংকল্প করলেন। ওই সংকল্পের দিন রাতেই আবার স্বপ্নে দেখেন— একজন পক্ককেশ উজ্জ্বল বর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁকে বলছেন— ‘তুমি তারাপীঠে গিয়ে বামাক্ষ্যাপার শরণ নাও। তিনিই তোমার অভীষ্ঠ লাভ করিয়ে দিবেন।’

নলিনীকান্ত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তারাপীঠে এসে বামাক্ষ্যাপার সান্নিধ্যে থেকে এক রাতের চিতা সাধনায় মহামায়ার দর্শন পেলেন আপন স্ত্রী রূপে এবং বর দিয়ে বললেন— ‘ইচ্ছামাত্র তুমি আমাকে এভাবেই দেখতে পাবে।’

এবার চলে এলেন নলিনীকান্ত পূর্বের কর্মস্থলে। কিছুদিন পর তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, ‘কে এই তারা— যিনি ইচ্ছামাত্র দর্শন দিয়ে আবার মিলিয়ে যান নিজ দেহে এসে?’ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে তিনি পুনরায় ছুটলেন বামাক্ষ্যাপার কাছে। বামা ধ্যানে বসে সব জেনে তাঁকে বললেন— ‘তুমি জ্ঞানীগুরুর সন্ধান কর। তার কাছেই সব জানতে পারবে।’

ক্ষ্যাপার নির্দেশে নলিনীকান্ত চিরদিনের মতো সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে আজমীরে এসে দৈবক্রমে দেখা হল জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দ পরমহংসের সঙ্গে— যিনি একদা স্বপ্নে তাঁকে বিল্বপত্রে লেখা একাক্ষরী মন্ত্র দিয়েছিলেন। অতঃপর গুরুর সান্নিধ্যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিগমের নিগূঢ় তত্ত্ব (বেদান্ত তত্ত্ব) আয়ত্ত করায় গুরু তাঁকে সন্ন্যাস দিয়ে নাম দিলেন— নিগমানন্দ। পরে তাঁকে যোগাবলম্বনে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নির্দেশ দিয়ে বললেন— ‘তুমি পূর্বভারতের দিকে চলে যাও, সেখানে তোমার যোগীগুরু আছেন।’

নিগমানন্দ কলকাতা এসে একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে অসমের পরশুরামতীর্থে এসে রক্তামাশায়ে সংজ্ঞাহীন হন। সঙ্গীগণ তাঁকে এ অবস্থায় ফেলে রেখেই চলে যান। পরে বনবাসীদের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে উঠে তিনি তাদের বস্তিতেই থেকে যান। একদিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে অনেক দূরে এক টিলার উপর বসে ভাবস্থ হলেন। ভাব যখন কাটল তখন অনেক রাত হয়েছে দেখে আত্মরক্ষার জন্য এক বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নিলেন। শেষরাতে তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রা যখন কাটল, তখন চেয়ে দেখেন ওই বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালিয়ে এক সাধু গাঁজা টানছেন। নিগমানন্দ ইতস্তত ভেবে তাঁর সামনে নেমে এলে ওই সাধুটি ইশারায় নিগমানন্দকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেন এবং পরে

তালপাতা ইত্যাদির পুঁথিপত্রে ভরা এক পার্বত্য গুহায় ঢুকে বলেন— ‘তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি যোগবলে সবকিছু জেনে তোমাকে ওখান থেকে আনতে গিয়েছিলাম।’

আমরা এতক্ষণ যে সাধুর কথা বলছিলাম, তিনি আর কেউ নন, নিগমানন্দের যোগীগুরু সুমের দাসজি। পূর্বাশ্রমের নাম— কুথমিলাল। বয়স দেড়শত বছর, যিনি একসময় পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের সভাসদ ছিলেন। প্রসঙ্গত, এই সুমের দাসের প্রচেষ্টা এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় এ্যানি বেসান্তরা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

সে যাই হোক, জনমানবহীন এক পার্বত্য গুহায় কচু সিদ্ধ ইত্যাদি খেয়ে সুমের দাসজীর তত্ত্বাবধানে নিগমানন্দের চলল যোগ সাধনা। পরে এক সময় কামাক্ষা পাহাড়ে এসে যোগের সর্বশেষ অবস্থা নির্বিকল্পে উঠে সেখান থেকে ‘আমি গুরু’ এই জ্ঞান নিয়ে হল তাঁর ব্যুত্থান। এরই অব্যবহিত পর তিনি কুম্ভমেলায় এসে সাধু মহাসভায় তাঁর গুরুদেব সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। সাধু সম্মিলনীর সন্তরা নিগমানন্দের নির্বিকল্প অবস্থা লাভ হয়েছে বুঝতে পেরে তাঁকে পরমহংস উপাধিতে ভূষিত করেন।

নির্বিকল্প সমাধি ব্যুত্থিত নিগমানন্দের বৈদান্তিক মনে ব্রহ্মের লীলাজগৎ সম্পর্কে আদৌ বিশ্বাস ছিল না। এই মন নিয়েই তিনি এলেন কাশীতে। এক রাতে কাশীশ্বরী মা অন্নপূর্ণা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন— ‘বৎস! যিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই আবার সাকারে সগুণে নেমে লীলা করছেন। .... ভাব বা লীলা জগৎ তোমার নিকট এখনও অজ্ঞাত। কাজেই তুমি অপূর্ণ। ভাবের সাধনা কর, সব খুলে যাবে।’

মায়ের স্বপ্নাদেশে নিগমানন্দের পূর্ব পরিচিতা প্রেম বা ভাবসিদ্ধা এক যোগীনি গৌরী মার কথা মনে পড়ল— যার বয়স তখন আড়াইশত বছর। পরদিন সকালেই তিনি ছুটলেন সেই যোগিনীর আশ্রম হিমালয়ের মসৌরী পাহাড়ে। সেখানেই গৌরীমার মাতৃস্নেহে থেকে নিগমানন্দের প্রেমোন্মাদ অবস্থা লাভ হল। তখন ‘যত্র যত্র নেত্র পড়ে’ তত্রই তিনি দেখতে পান তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রী রাণীকে।

এভাবেই তিনি একের পর এক তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেম পথে সিদ্ধ হয়ে ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ কল্পে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে মুমুক্ষুকে জ্ঞান দান এবং আর্ত-ক্লিষ্ট নর-নারীর আজীবন সেবা করে গেছেন এবং পরে বিদায় পূর্বকালে তিনি তাঁর উত্তর পুরুষের কাছে ভবিষ্যৎ লোকোদ্ধারের দায় বুঝিয়ে অবশেষে ১৩৪২ বাংলার ১৩ই অগ্রহায়ণ মরদেহ ত্যাগ করেন।

প্রসঙ্গত, কিংকর সামানন্দ ব্রহ্মচারীর একটি উক্তি এখানে স্মর্তব্যঃ— “আপাত দৃষ্টিতে ‘প্রিজম’ যেন এক টুকরো কাঁচ, কিন্তু তার মাধ্যমে একটাই আলো সাতটা টুকরো হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়, তেমনি নিগমানন্দ পরমহংস ছিলেন ‘ফোর ইন ওয়ান’। তাঁর শ্রীবিগ্রহকে কেন্দ্র করে জ্ঞান, যোগ, তন্ত্র ও ভাব— এই চারটি সাধনার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আজও ভক্তজনের পথ প্রদর্শন করছে।”

তাঁর বাণী— (১) “তোমরা আপন ভুলিয়া প্রেমভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ কর, গুরুর উপদেশ মতো চরিত্র গঠন কর, সংযত হও, পৃথিবীর, নরনারীকে ভাই ভগ্নীজ্ঞানে জড়াইয়া ধর, রোগীর শুশ্রূষা কর, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান কর, দুঃখীর অশ্রু মুছাইয়া দাও, তাপিতকে বুকে ধর, পাপীকে ঘৃণা না করিয়া তোমাদের প্রেমজলে তাহাদের পাপময়লা ধুইয়া দাও। স্বার্থপর শয়তানকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া প্রেমময় ভগবানকে আসন দাও। ইহাই ধর্ম।”

(২) “কালের পরিবর্তনে শাসকের পর শাসকের পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিক বহু বিপর্যয়ের মধ্যে এই সনাতন ধর্ম এখনও জীবিত আছে সত্য, কিন্তু অস্থিচর্মসার। হিন্দুর আজ বড় দুর্দিন। সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে— নতুবা আর উপায় নেই।”

— ঠাকুর নিগমানন্দ

তথ্যসূচী : (১) শ্রীশ্রী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণী— শ্রীমৎ সত্যচৈতন্য ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ শক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী, অষ্টম সংস্করণ, ১৪০৮। (২) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত— শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮৮। (৩) বিশ্ব হিন্দু বার্তা, আশ্বিন, ১৩৯২।

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[*কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩*]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

নবাঙ্কুর

বিপদ রুখতে সমবেত উদ্যোগ

সকলে মিলে নদীর বাঁধ মেরামত

নদীর বাঁধের ধারের মাঠে কাজ করার সময় কেমন একটা আওয়াজ শুনতে পেল বাদল। সে আলের উপর বসে পান্তা ভাত খাচ্ছিল আলু ভাতে পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে। খুব আরামে আনন্দে পরিতৃপ্তিতে খাওয়া। আওয়াজটা ভালো মনে হলো না বাদলের। সকালে দেখে এসেছিল নদী ভরা জলে। বেশ স্রোতের টান। ডিভিসি একটু বেশি বৃষ্টি হলেই জল ছাড়ে। তখন নদী হয়ে ওঠে টইটুম্বুর। জল ছুটে যায় নদীপথে মোহনার দিকে। আরও বেশি জল ছাড়লে বাঁধ ছাপিয়ে জল ঢুকবে। জল ঢুকলেই বিপদ! আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে? কান খাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করল। তারপরই দৌড়

দিল দেখার জন্যে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। নদীর বাঁধের ফাটল দিয়ে জল ঢুকছে হু হু করে। বাদল চিৎকার করে ডাক দিলো, 'বটগাছতলার কাছে ফাটল। জল ঢুকছে।' আশপাশের মাঠে যারা কাজ করছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল 'যাই-ই'।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফাটল বন্ধ করার জন্যে সবাই লেগে পড়ল ঝুড়ি কোদাল নিয়ে মাটি কাটার জন্যে। কাউকে বলতে হলো না। সবাই ছুটে এসে লেগে পড়েছে। খবর চলে গেছে আশপাশের সাতটা গ্রামে। ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ছুটে আসছে। সামনে বিপদ। সবাই মিলে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা। অভিজ্ঞতা আছে অনেকের। তারা বলতে লাগল। আর সবাই সেভাবে কাজ করতে লাগল। গাঁয়ের সকলের কত মিল। ঝগড়াঝাঁটি ভুলে গেছে। মেয়েরা বাড়ি থেকে মুড়ি জল নিয়ে এসেছে। বাদল সকলের সঙ্গে মাটি কেটে ফেলছে। সন্ধের মুখে কাজ শেষ হলো।

বাদল বাড়ি ফিরে চানটান সেরে দুয়ারে খেজুর পাতার চ্যাটা বিছিয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। খুব খাটুনি হলে খিদেও যেন উধাও হয়। বাঁধ মেরামতির সময় তার মা-কাকি-পিসি মুড়ি তরকারি পেঁয়াজ লঙ্কা পাঠিয়েছিল অনেকের জন্যে। বাদলের খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। কাজে সে মেতে ছিল। কাকি ডাকল, 'বাদল খেয়ে নে। ভাত হয়ে গেছে।' তাড়াতাড়ি ভাতে ভাত রান্না করেছে কাকি। বাদলের খুব পছন্দের জিনিস রয়েছে। আলুভাতে, ডালভাতে, পেঁপে ভাতে। সঙ্গে দুধ। বাদল খেয়ে নিলো। ক্লান্তিতে ঘুম ধরে গিয়েছিল। খাবার পেয়ে ক্লান্তি দূর হলো অনেকটাই। রাতে নদীর বাঁধ পাহারায় থাকছে লোকজন। বাদল একটু ঘুমিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক করল। তাকে কেউ বলেনি যেতে। তবু সে যাবে।

'নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারোমাস' কথাটা মা ঠাকুমার কাছে অনেকবার শুনেছে। গ্রাম-ভাসানো বন্যাও সে দেখেছে। কয়েকবছর আগেই তো বন্যা হয়েছিল। প্রচুর বৃষ্টিতে জল ঢুকেছিল বাঁধ ছাপিয়ে। গ্রামের চারদিকে জল। একটার পর একটা মাটির বাড়ি পড়ে গেলো। কলার ভেলা তৈরি হয়েছিল অনেকগুলো। গ্রামের অনেক বাড়ির লোকজনকে নদীর বাঁধে পৌঁছে দিয়েছিল বাদল আর গ্রামের ছেলের দল। বুক পর্যন্ত জল ঠেলে ভেলা টেনে নিয়ে গেছে। নদীর বাঁধ নিরাপদ। সেখানে অস্থায়ী বাসের ব্যবস্থা হয়েছে।

রাতারাতি এসে গিয়েছিল ত্রাণসামগ্রী। বাদলরা সে ব্যাপারেও ছোটাছুটি করেছিল। ত্রাণসামগ্রী বন্টনে পার্টির লোকেরা মাতব্বরি করতে চাইছিল। বাদলরা সেসব হতে দেয়নি। স্পষ্ট বলেছে, 'পার্টিগিরি চলবে না।' সরকারি বেসরকারি ত্রাণ ঠিকমতো পৌঁছেছে। বন্যার সুযোগে চোর-ডাকাতের দল নৌকো নিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। বাদলরা তাদেরও রুখেছে। গ্রামের ডাকাবুকো মানুষ বাঁশি দাস, বিপদের সময় তাকে দেখা গেছে অন্যভাবে। সে সারারাত জেগে বল্লম হাতে বাঁধে পাহারা দিয়েছে। বলেছে, 'আমি থাকতে কারও কোনও বিপদ হবেনি।' ছেলের দলও জেগেছে। সকলের খবর নিয়েছে। খাবার দাবার ওষুধটষুধ ঠিকমতো পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে তাদের যাদের কেউ নেই।

জল সরে গেছে কদিন বাদে। গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি সবাই সঙ্গে সঙ্গে। ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। অন্যকোনও ব্যবস্থা তো করতে হবে। বাদলরা সেকাজেও উঠে পড়ে লেগেছে। অল্পদিনের মধ্যে নদীর বাঁধ থেকে গাঁয়ে চলে এসেছে সবাই। দিনরাত এক করে বাদলরা কয়েকজন খেটেছিল। সরকারি অফিসাররা হয়তো ভেবেছিল বাদলরা কোনও পার্টির লোক। পরে যখন জেনেছে প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবী তরুণ, তখন তাদের কথাকে প্রথমে গুরুত্ব দিয়েছে। সেই বন্যার পরে গ্রামে মাটির বাড়ি আর নেই। বাদলদের বাড়ি পাকা। ওদের মাটির দোতলা বাড়ি পড়ে গিয়েছিল বন্যার জলে।

পাশের বাড়ির পচাদা, মানে ফণিভূষণ রায় ডাকতে এলো, 'বাঁধে যাবি নাকি বাদল?' টর্চ লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাদল। গাঁয়ের তেমাথায় এসে দেখল, আরও অনেকে যাচ্ছে। ঘুম নেই কারও চোখে। গ্রামের নিরাপত্তা আগে।

কৌশিক গুহ

চয়নিকাদির গল্পের ক্লাস

গল্পের টান ছোটোদের কাছে চিরনতুন

'বই পড়ো বই' একথাটা সবাইকে বলেন চয়নিকাদি। তাঁর কাছে গল্প শুনেছে একসময় উঁচু ক্লাসের ছেলেরা। এখন শোনে নিচু ক্লাসের ছেলেরা। গল্পে তারা মেতে ওঠে। চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে। কোন কোন গল্প আবার শুনতে চায়। ফিরে ফিরে বলতে হয়। চয়নিকাদি এতবছর ধরে বুঝেছেন ছোটোদের গল্প কখনও পুরনো হয় না। এখন যারা বড়ো হয়ে গেছে তারাও তাঁর কোলঘেঁষে বসে গল্প শুনেছে। গল্প শোনার পর তারা ক্লাসের পড়া করেছে খুশি মনে। চয়নিকাদির কাছে এমন অনেকে পড়েছে যাদের ছেলেরাও তাঁর মুখে গল্প শুনেছে। চয়নিকাদি কাছে শোনা একটা গল্প রাহুল একদিন ঠাকুমাকে বলেছিল। ঠাকুমা বলেছিল, 'এই গল্প তোর বাবা শুনে এসেছিল চয়নিকাদির কাছে। তোর বাবারও ভালো লেগেছিল তোর মতো।' রাতে রাহুল বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমরা চয়নিকাদির কাছে গল্প শুনতে?' সন্দীপ বলেছিল, 'খুব শুনতাম। এখনও কিছু কিছু স্পষ্ট মনে আছে।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন কোথায় রয়েছে? তার বয়স কত? স্থানীয় লোকজন কি বলে? প্রতিষ্ঠাতা কে? কতটা জায়গা জুড়ে এই উদ্যান? তত্ত্বাবধান করে কারা? এখন উদ্যানের পুরো নাম কি?

২. ভারতের জাতীয় পাখি কি? কোন সালে ঘোষণা করা হয়?

৩. ভারতের জাতীয় নদীর নাম?

৪. কোন পরিবেশবিদ্ প্রথম নোবেল পুরস্কার পান?

৫. কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন?

উত্তর : ১. হুগলি নদীর ধারে হাওড়ায়। ১৭৮৭ সালে গড়ে ওঠে। এখন ২২৫ বছর। বি-গার্ডেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল রবার্ট কিড। প্রায় ২৭৩ একর। ভারত সরকারের বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন। ২. ময়ূর। ১৯৬৩ সালে। ৩. গঙ্গা। ৪. ওয়াংগারি মাথাই, যাঁকে বলা হয় 'আফ্রিকার গাছ-মাতা'। ৫. জগদীশচন্দ্র বসু।

ছোটোদের বলছি

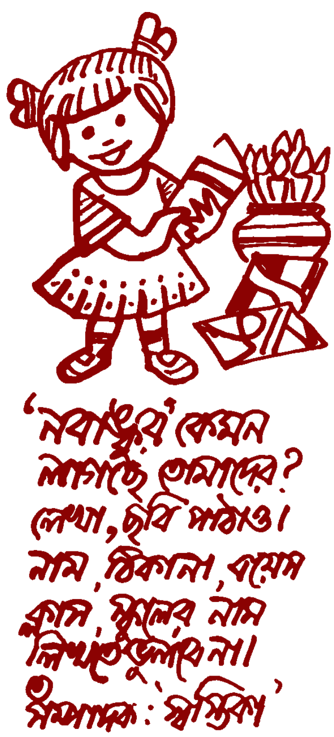

উলটো পালটা

বাড়িওয়ালা গোবিন্দ সাউ লোকটা সুবিধের নয়— একথা বলে তার সব ভাড়াটেই। লোকটা আগে কোথায় কাজ করত। চুরির দায়ে ধরা পড়ে। মালিকরা বলে, 'তুমি হয় চাকরি ছাড়ো, নয়তো আমরা পুলিশকে জানাবো।' গোবিন্দ ভাবল, 'থাক চাকরি। পুলিশের হাত থেকে বাঁচা দরকার।' গোবিন্দ অনেকদিন ধরে চুরি করে বাড়ি জমি করেছিল স্টেশনের কাছাকাছি। একদিন এক নতুন ভাড়াটে ঘর দেখে বললেন, 'ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। এরকম সবসময় পড়ে নাকি? তাহলে থাকা যাবে কিভাবে?' গোবিন্দ সাউ পান দোক্তা খাওয়া দাঁত ছড়িয়ে বলল, 'অন্য সময়ে কোনও অসুবিধে হয় না। বৃষ্টি হলে একটু সমস্যা। নয়তো সারাবছর একেবারে শুখনো। কোনও সমস্যাই নেই।'

।।২।।

পীতারুণ স্যারের ক্লাসে অনেক কিছু শেখা যায়। ছাত্ররা মন দিয়ে তাঁর কথা শোনে। অবশ্য কিছু বুঝতে পারে, কিছু পারে না। না-বোঝা কথা বুঝতে চায় না কেউ। কারণ তাতে স্যারের অনেকদিন লেগে যাবে বোঝাতে। সেদিন জিগ্যেস করলেন, 'অধিকরণ কারকের উদাহরণ দাও।'

চটপট উত্তর দেওয়ার অভ্যেস নীতিনের। সে বলল, 'পার্টির ছেলেরা জমি অধিকার করেছে।'

।।৩।।

কমল নাগ শোভাবাজারের রকে বসে লক্ষ্য করছিলেন কে কোথায় আসে যায়। অনেকদিন বাদে দেখা দেবজিতের ছেলে টুবলাই-এর সঙ্গে। তাকে দুচার কথার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে টুবলাই, তুই কি খেতে ভালোবাসিস?'

টুবলাই একটু তাকিয়ে বলল, 'আমাকে প্রথমে জানতে হবে, এটা কি শুধুই প্রশ্ন, না তোমার জন্মদিনের নেমন্তন্ন?'

রামগরুড় সংকলিত

এক ব্যতিক্রমী নির্ভীক সাংবাদিক ফ্রান্সেস

অঙ্গনা

মিতা রায়

সাংবাদিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল পেশা। একটা সময়ে কেবলমাত্র পুরুষেরাই এই পেশায় আসতেন, কারণ, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এমার্জেন্সিতে স্থান-কাল-বিবেচনা ব্যতিরেকে ছুটে যেতে হয় খবর সংগ্রহ করতে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে বাস্তবের মুখোমুখি হতে গিয়ে মেয়েরাও এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষের মতোই সব পেশাতেই মহিলারা এগিয়ে আসছেন। তবুও মহিলা সাংবাদিকদের কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে এমন একজন বিদেশিনী সাংবাদিকের কথা— যিনি একাধারে পেশায় দুঃসাহসিনী সাংবাদিক এবং অন্যদিকে ছোট্ট শিশুর মা। আসুন আমরা জেনে নিই তাঁর কথা। তিনি হলেন বি বি সি-র দুর্জয় সাংবাদিক ফ্রান্সেস হ্যারিসন। তাঁর চরিত্রে আছে একদিকে নির্ভীকতা কঠোরতা, অন্যদিকে সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের কোমল হৃদয়।

সাংবাদিকতার যে কাজ সবচেয়ে কঠিন অর্থাৎ রিপোর্টিং-এর কাজ, সেই কাজে ফ্রান্সেস দক্ষ। যে কোনও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ডামাডোলে জরুরি পরিস্থিতি, ইরানের যুদ্ধকালীন বিপজ্জনক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখনই ডাক এসেছে তাঁর কাছে, খবর সংগ্রহ করতে ছুটে গেছেন মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে। আসলে ওঁর কাছে মৃত্যুভয় বড় ছিল না; ছিল দায়িত্বপূর্ণ মানসিকতা। তাই, 'অ্যাসাইনমেন্ট' তাঁর কাছে বড়। এইভাবে ছুটে চলেছেন একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এই অসমসাহসী মনোবল তাঁর কীভাবে গড়ে উঠল ভাববার আগেই তাঁর বলিষ্ঠ জবাব : এই প্রেরণা আমার মা। মার কাছ থেকেই অসম সাহস পেয়েছি। আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে মা সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কর্মজীবনের কর্তব্য যথাযথ পালন করে গেছেন আমাদের মতো ছোট সন্তানদের বাড়িতে রেখে। কিন্তু মা আমাদের প্রতি কখনও অবহেলা করেননি। আমাদের কোনও কষ্ট হচ্ছে কিনা, ঠিকমতো খেয়েছি কিনা জানার জন্য কাজের ফাঁকে মা ফোন করে জেনে নিতেন। সন্তানের প্রতি কর্তব্যবোধ তাই ফ্রান্সেসের মধ্যে প্রোথিত হয়েছিল।

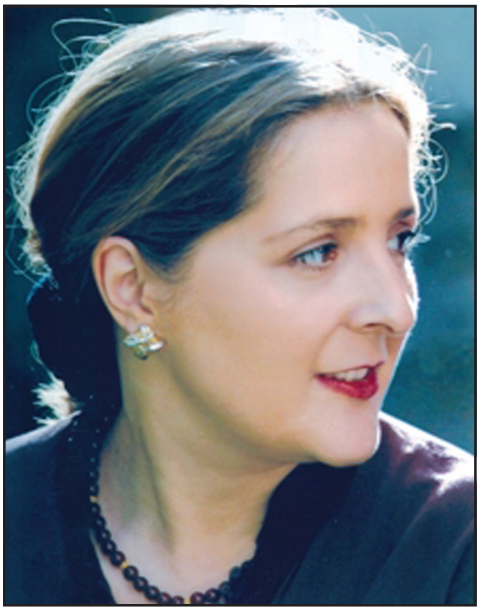

ফ্রান্সেস হ্যারিসন

সময়ের স্রোতে স্বাভাবিক নিয়মে ফ্রান্সেস বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এক সাংবাদিকের সঙ্গে। দাম্পত্য জীবনে কখনও কাজের ক্ষেত্রে কোনও বাধা আসেনি। এমনকি তাঁর দুঃসাহসিকতা ছিল এমনই যে তিনি কখনও বুঝতে দেননি যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা। সেই অবস্থায় এতটুকু দ্বিধা না করে ছুটে গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাস্তায় প্রতিবাদী মানুষের মিছিলে পা মিলিয়ে হারিয়ে গেছেন নিজে। হেঁটেছেন বহু রাস্তা অক্লান্তভাবে। পুলিশের লাঠিচার্জ উপেক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সচেতন ছিলেন যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা। মাতৃত্বের ভাব তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। কখনও দুর্বল হয়ে পড়েননি। এমনকি সহকর্মী ও বসকে বুঝতে দেননি তাঁর সন্তানসম্ভবার কথা। এমনই ছিল তাঁর মনের জোর। তাঁর জীবনের আরও রোমহর্ষক ঘটনা তাঁকে এক সময় সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটা ঘটনা তাঁর দুঃসাহসের পরিচায়ক। সন্তান যখন দু' মাসের, তখন তাঁর শ্রীলঙ্কা যাবার নির্দেশ আসে। সেখানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তখন। কালবিলম্ব না করে নির্দেশ মতোই মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাগে দু' মাসের শিশুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চললেন শ্রীলঙ্কা। শুধু মাথায় ঘুরছে ভাল একটা ক্রেশজাতীয় সংস্থা খুঁজে বার করা, যেখানে বাচ্চাকে রাখা যায়।

স্বামীও তাঁর সাংবাদিক। ফলে দু'জনেই কাজের তাগিদে ছুটে বেড়ান এখানে ওখানে। ওঁদের দু'জনেরই বোঝাপড়া ভাল। সন্তানকে দেখভালের জন্য কখনও দু'জনেই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যান না— কারণ কোনও বিপদ ঘটলে সন্তান যে অনাথ হবে। সন্তানকে সুনজরে রাখার এতটাই স্বার্থত্যাগ সাংবাদিক ফ্রান্সেসের। তাঁর এই মানসিকতাকে বাহবা জানিয়ে তাঁর কর্মজগৎ তাঁর পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বিবিসি-র কাছে কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : সন্তানকে ছত্রছায়ায় রাখার জন্য বাড়তি নিরাপত্তা তারা দিয়েছিল। সন্তানের কাছে 'মা' হিসেবে যখন বিছানায় তাকে কাছে টেনে নিয়ে গল্প বলা, ঘুমপাড়ানোর ভূমিকায় থাকেন ফ্রান্সেস, তখন কে বলবে এই মানুষটাই শ্রীলঙ্কা, ইরানেও জরুরি পরিস্থিতিতে রাতজাগা দক্ষ ফ্রান্সেস!

শুধু নিজের কাজকে বড় করে দেখা নয়, সন্তানকে স্নেহের আঁচলে রেখে মায়ের যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে— এমন এক প্রবাদবাক্যের তিনি একজন সার্থক দৃষ্টান্ত। ❑

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা

শিবাজী গুপ্ত

সাবাস গুপ্তের পো কবি ঈশ্বর গুপ্ত! কোন অসামান্য দূরদৃষ্টিতে প্রায় দু'শ বছর আগে লিখেছিলে এমন অমর কাব্যগাথা :

সুখের শিশিরকাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।।

কাব্য কথা ছেড়ে দিয়ে সাদা গদ্যে বলে— 'কত রঙ্গ দেখালি মা অম্বলে দিলি আদা!' আমাদের পোড়া পশ্চিমবঙ্গেও আমরা দিনরাত রঙ্গ দেখে চলেছি। একদিকে ৩৪ বছরের পাকাপোক্ত গদিহারার হাহাকার, অপরদিকে দীর্ঘ উপবাসের পর অপরিমিত খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ খাবার টেবিলে বসে কার আগে কোনটা খাব, কতটা খাব, আমিষ কি নিরামিষ খাব, না মাছ-দুধে-অম্বলে মিশিয়ে মাধুকরী করব, সে ভাবনায় দিশাহারা অবস্থা।

বঙ্গভূমি একদা ছিলেন রত্ন প্রসবিনী। সেসব রত্ন স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে সারা দেশে আলো ছড়িয়ে গেছেন। তাঁদের জয়ঢাক আপনা-আপনি বেজেছে। ঢাক বাজাবার ঢাকি ভাড়া করতে হয়নি। সূর্যকে আলো ধার করতে হয় না, কিন্তু চন্দ্র ধার করা আলোয় আলোকিত অর্থাৎ সূর্যের আলোকে আলোকিত। পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তমসামুক্ত হলে চারদিকে নতুন নতুন মহীরুহ মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিম-রবীন্দ্র হয়ে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ছুঁয়ে সুভাষচন্দ্র-শ্যামাপ্রসাদে তার পরিসমাপ্তি। এঁদের মাঝে মাঝেও অনেকে স্বীয় প্রতিভাবলে দেশে বিদেশে খ্যাতি -কীর্তি অর্জন করেছিলেন। তাদের কারও 'ব্যান্ড মাস্টার'-এর প্রয়োজন ঘটেনি। দরকার পড়েনি 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার'-এর; বাংলার হয়ে ঢাক পেটাবার ঢ্যাঁড়াদারের। হীরের ঔজ্জ্বল্য স্বতঃই প্রকাশ। তার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে রঙমিস্ত্রী ডাকতে হয় না। মহাকবি তো নিখাদ সত্য কথাটিই বলে গেছেন—

"কত বড়ো আমি কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।।

এখন তো বাংলার হয়ে প্রচার করার একটি জিনিসই আছে, তা হলো মিথ্যার বেসাতি ও সত্যের অপলাপ, ইতিহাসের বিকৃতি ও অসত্যের জয়ডঙ্কা বাজানো। তা না হলে কিসের পরিবর্তন? এগিয়ে যাওয়া যেমন পরিবর্তন, পিছিয়ে যাওয়া তেমনই এক ধরনের পরিবর্তন বই কি! আবার কোনও কোনও বিষয়ে না এগিয়ে বা না পিছিয়ে নট নড়ন-চড়ন হয়ে স্থবির হয়ে থাকা পরিবর্তন না হলেও অপরিবর্তন তো বটে!

রামপ্রসাদ গেয়েছেন— মা হওয়া কি মুখের কথা! আমরা বলবো, দিদি হওয়া কি মুখের কথা! তাও জনগণের দিদি। তিনি যে পথে যাচ্ছেন, দু'দিকেই দিতে দিতে যাচ্ছেন। সব সময় দি, দি বলছেন, না চাইতেও দিচ্ছেন। অকৃপণভাবে দিচ্ছেন বলেই হয়তো তিনি দিই দিই করতে করতে দিদি হয়ে গেছেন। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, আবার দশের মুখে মুখে ভূতও ভগবান হয়ে যেতে পারে। বিশেষত দিদি যখন একাই একের ভিতর দশ দশপ্রহরণধারী দুর্গার মতো তিনি দশহস্ত প্রসারিণী দিদি তো বটেই!

দিদিকে বলা যায় কলিযুগের দাতা কর্ণ (স্ত্রীং) বা আরও স্পষ্ট করে বলা ভাতা-কর্ণ। তিনি ইমামদের ভাতা দিচ্ছেন, মোয়াজ্জিনদের ভাতা দিচ্ছেন। যথেচ্ছা মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিচ্ছেন, মুসলিম ছাত্রীদের সাইকেল ও ছাত্রদের ল্যাপটপ দিচ্ছেন। তিনি কাউকে পদ দিচ্ছেন, কাউকে পদক দিচ্ছেন, কাউকে শিরোপা দিচ্ছেন, কারও গলায় উত্তরীয় পরাচ্ছেন, কারো গায়ে চাদর চাপাচ্ছেন। তাঁর অনুগ্রহ থেকে মদখোর সুদখোর নেশাকার পেশকার কেউ বাদ যাচ্ছে না। দাতা ও ভাতা তার নামের সঙ্গে এমনি জড়িয়ে গেছে যে কবে তিনি ভাতার দেওয়া পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন, সে আশা ও আশঙ্কায় অনেকেই দিন গুনছে। মোল্লা-ভাতা থেকে মোল্লা-ভাতারে উত্তরণ বা পরিবর্তন এমন কি আর কঠিন কাজ!

দিদি তো সর্বকলাপারঙ্গমা। বলতে গেলে সরস্বতীর বরকন্যা। তিনি লিখছেন, আঁকছেন, গাইছেন, বাজাচ্ছেন (হাততালি), নিজে না নাচলেও অন্যদের নাচাচ্ছেন— এমন কি লাটসাহেবকেও নাচিয়ে ছেড়েছেন। লাট সাহেবের আর একটা টার্ম মারে কে? বিশেষ করে এমন মজার রাজ্য ছেড়ে গেলে মাজার ব্যথা সারাবার নাচের ব্যবস্থা অন্য রাজ্যে নাও মিলতে পারে! কোন এক আঁচল ধরা মন্ত্রীপুঙ্গব বলেছেন— কে কে আর-এর আই পি এল জয় নাকি দিদির মা-মাটি-মানুষের জয়। কবে শোনা যাবে সূর্যের উদয়াস্ত, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাও খেলে মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর কৃপা বলে। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম বুঝি একেই বলে!

দিদি যেসব বঙ্গ-ভীষণ বঙ্গ-বিভীষণ সৃষ্টি করেছেন, একদিন হয়তো তারাই বৃটিশ আমলের খয়ের খাঁ-দের গান কিঞ্চিৎ 'পরিবর্তন' করে গাইবে—

দিদি বড় দয়ালু;
তার দয়ায় দাড়ি গজায়—
শীতকালে খাই শাঁকালু।।

দিদির ভাইদের দিনদিন আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক, বাড়-বাড়ন্ত হোক, ধনেপোতে লক্ষ্মীলাভ হোক। দিদির আঁচলের সঙ্গে তাদের গ্রন্থি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হোক। দিদির নামে তাঁরা লটারীর টিকিট কাটুন, ভাগ্যে থাকলে শিকে ছিঁড়তেও পারে! দিদি-ইজম বা দিদিবাদ জিন্দাবাদ!

জাতীয় দলগুলি গুরুত্ব হারাচ্ছে

অতিথি কলম

এস কে সিন্‌হা

যে কোনও প্রাণবন্ত বা প্রবহমান গণতন্ত্রে একটি শক্তপোক্ত বিরোধী দল থাকা জরুরি। তারাই পারে শাসক দলটিকে অবিসংবাদিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে আটকাতে। কোনও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে আক্রান্ত বা দুর্বল বিরোধী দলের পক্ষে রুখে দাঁড়ানোর এই কাজটি করা সহজ নয়। পৃথিবীর তুলনামূলকভাবে প্রবীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে বৃটেন ও আমেরিকায় প্রধানত দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই লড়াই হয়। আমাদের দেশে স্বীকৃত সর্বভারতীয় দল ৬টি, অন্যদিকে রাজ্য কেন্দ্রিক দলের সংখ্যা ৪৫। এদের ছাড়াও নির্বাচনের সময় বহু নির্দলীয় প্রার্থীই মাঠে নেমে পড়েন। এর থেকেই একটি বহুধা বিভক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়।

আজকের দিনে আমাদের মূল দু'টি রাজনৈতিক দলই বেশ এলোমেলো অবস্থায়। কম্যুনিস্টরাও গুরুত্ব হারিয়ে জড়সড়। শাসক কংগ্রেস দলটি নানান তুলনারহিত অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অর্থনীতির পরিসংখ্যানগুলির ক্রমিক অবনমন ভবিষ্যতে ভারতের পৃথিবীর মধ্যে প্রথম তিনটি শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার ব্যাপারটিকে স্বহস্তে ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। ২০০৯ সালের নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে ইউপিএ-২-তে কংগ্রেস ২০০৪ সালের থেকে আরও শক্তিশালী দল হিসেবে দেখা দেয়। সেই সময় দেশের অর্থনীতি ছিল তেজিয়ান। ২০১০ সালের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশেরই প্রধানরা একের পর এক দিল্লীতে এসে দেখা করে যান। এর মধ্যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ওবামাও ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের জন্যে ৫০ হাজার চাকরির খোঁজে বাজার যাচাই করতে এসেছিলেন। অথচ মাত্র দু' বছরের মধ্যেই সমগ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেল আমূল। হায়! রাজনীতির ক্ষেত্রে যেখানে একটা সপ্তাহই টালমাটাল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, যেখানে ২০ বছর তো অসীম সময়। অত্যন্ত অপরিণামদর্শিতা - প্রসূত পেট্রলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও হতাশার জন্ম দিয়েছে। ইউপিএ-২ সরকারের শরিকেরাও এই মূল্যবৃদ্ধিতে তাদের বিক্ষোভ দেখাতে দ্বিধা করেনি। অতীতে কখনও কোনও সরকারকে জনগণের থেকে এমন বিচ্ছিন্ন ও দোলাচলচিত্ততায় ভুগতে দেখা যায়নি।

এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলই নখদন্তহীন হয়ে পড়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। রাজনৈতিক মানচিত্রের একটা ঘোলাটে চেহারা। বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয় ও জোট শরিক দলগুলির চোখ রাঙানির কাছে নির্জীব আত্মসমর্পণ দেখলে মনে হয় শাসকদল বোধ হয় শাসনের অধিকারই হারিয়েছে।

শাসকদলের এমন একটা নীতি-পঙ্গুত্বের অবস্থার সুযোগ নিতে মূল বিরোধী দল বিজেপি কিন্তু তৈরি নয়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি-র ফলাফল খারাপ হয়। 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর স্লোগান মুখ থুবড়েই শুধু পড়ে না অনেকটা ব্যুমেরাং হয়ে যায়। অন্তর্দলীয় কলহ জিইয়ে রাখার ফলে ভালোর বদলে ২০০৯ সালে এই ফলাফল আরও খারাপ চেহারা নেয়। এক সময়ের একটি 'ভিন্ন ধারার দল' ততদিনে একটি 'বিভিন্ন মতের' দলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অথচ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির প্রাথমিক দায়িত্বই ছিল অগুণতি কেলেঙ্কারী আক্রান্ত কংগ্রেস দলকে নাস্তানাবুদ করা। বাস্তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির জেহাদ আদৌ বিশ্বাসযোগ্যই হলো না।

আজকের বিজেপিকে দেখে মনে হয় তারা কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড কিংবা নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশে দুর্নীতির সঙ্গে হাত মিলিয়েই চলেছে। কর্ণাটকে দুর্নীতির যে মেঘ ছেয়ে রয়েছে বিজেপির উচিত ছিল তাকে কঠিন হাতে দমন করা। তাতে একটা রাজ্যের শাসনভার চলে গেলেও আখেরে কিছু যায় আসত না। এমন একটা সদর্থক উদাহরণ অন্য অনেক রাজ্যে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করত। এর ওপর দলকে ঘিরে বিভিন্ন নেতাদের নিজেদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সাধ মিটিয়ে নেওয়ার বিষয়টাও অনেক সময়ই দলকে কলঙ্কিত করেছে।

এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলই নখদন্তহীন হয়ে পড়েছে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক দলগুলি শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। রাজনৈতিক মানচিত্রের একটা ঘোলাটে চেহারা। বিভিন্ন রাজ্যের

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয় ও জোট শরিক দলগুলির চোখ রাঙানির কাছে নির্জীব আত্মসমর্পণ দেখলে মনে হয় শাসকদল বোধ হয় শাসনের অধিকারই হারিয়েছে। অবস্থাটা অনেকটা মোঘল জমানার শাহ-আলমের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মোঘল সম্রাটের বংশধর আলমের কর্তৃত্ব একটা সময় দিল্লী আর পালখের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গার ক্ষমতাশালী সুবেদাররাই ইচ্ছেমতো লাঠি ঘোরাত। একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার যেমন দেশের পক্ষে ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী ঠিক তেমনই দুর্বল রাজ্য সরকারও দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই জন্যই দেশের স্থায়িত্ব নিরাপত্তা সম্মান ও সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যিক। এখানে এটা বোঝার কোনও কারণ নেই যে আমি কেন্দ্রে কোনও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বলবৎ করার কথা সুপারিশ করছি যা সর্বদাই রাজ্যগুলির সঙ্গে একটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক চালু রাখবে। এমনটাই দেখা গিয়েছিল প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর সময়। চোখের পলক পড়ার আগেই অনেক সময় এক একটি রাজ্য সরকারের পতন হয়ে যেত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন দিল্লী 'দরবারের' মনোনীত আজ্ঞাবাহক। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু কখনই আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটির ওপর আঘাত হানতে তো পারবেই না বরং রাজ্যগুলিকে অনেকটাই স্বয়ংশাসিত থাকার বিষয়ে তৎপর হবে। তাই ভারতের প্রয়োজন দৃঢ় কেন্দ্রীয় সরকার, একই সঙ্গে মজবুত রাজ্য সরকার।

আমি জানি দেশের বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয় দীর্ঘদিন কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের শীর্ষে পরিবারতন্ত্র গেড়ে বসার ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। তবু বলব এই পরিবারতন্ত্র অন্তত কংগ্রেস দলটিকে একটি নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। দলের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার দৌড়ে বা প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার লড়াই সেখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শোরগোল পাকাবার মতো তিক্ততা তৈরি করে না। রাহুল গান্ধী দলের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রীত্বের অবিসংবাদিত হকদার।

রাহুল গান্ধীকে একটা বিষয়ে সাধুবাদ দেওয়া যায় যে তিনি অন্তত তাঁর উত্তরাধিকার আদায় করার ব্যাপারে সেরকম তাড়াহুড়ো দেখাচ্ছেন না। তিনি দলকে সংগঠিত করার চিন্তায় আন্তরিক আর তার জন্য পরিশ্রমও করছেন যথেষ্ট। সংবাদমাধ্যমগুলি তাঁকে নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছে যাতে যে কোনও ভাবে তাঁকে যুব সমাজের এক আদর্শ মহামানব বানানো যায়। তিনিও কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ দু'টো রাজ্যেই ভয়ঙ্কর পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছেন।

একথা প্রায় প্রবাদ যে চাটুকার-মোসায়েবদের দলই ধ্বংস করে সম্রাট ও সাম্রাজ্য। তাই কংগ্রেস দলকে সাবধান হতে হবে তাদের এই চাটুকার বাহিনীর মতলব সম্পর্কে। রাহুল গান্ধী কংগ্রেসে তরুণদের যোগদান করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাল কথা। তবে নজর করলে দেখা যাচ্ছে এই তরুণদের অধিকাংশই বরাবর নেহরু গান্ধী-পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা দলবলেরই পুত্র-কন্যা। আদতে কেউই তৃণমূল স্তরে কাজকর্ম করেননি। প্রায় সবাই-ই দিল্লীতে বসে-বসেই লাঠি ঘোরাচ্ছেন।

কংগ্রেসের মতো বিজেপিরও তাদের ঘর গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকরা আশায় ভর করে দলের দিকে তাকিয়ে আছে। দলের সর্ব বরিষ্ঠ নেতা আদবানী তাই সময়োচিত ভাবেই দলকে আত্মবিশ্লেষণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যে কোনও গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে মতভেদ বা মতানৈক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দল তার মূল অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিলিতভাবেই যে কাজ করবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে বিজেপির সুবিধে হলো কেন্দ্র বা রাজ্য দু' জায়গাতেই তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কোনও অভাব নেই। বর্ষীয়ান ও সার্বিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লালকৃষ্ণ আদবানী ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উভয়েই বিপুল গণভিত্তির অধিকারী নেতা। আদবানী তো রাজনীতিতে জীবনই কাটিয়ে দিলেন। কত গুরুত্বপূর্ণ পদেই না তিনি থেকেছেন। বহু দশক ধরে বিস্তৃত তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিগত সততা ও সত্যের নিরিখে তিনি এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। বাজার চলতি আর পাঁচজন রাজনীতিবিদদের মতো তিনি কখনই তার পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে গুঁজে দেবার চেষ্টা করেননি। তাঁর নিন্দুকেরা কিছু না পেয়ে বলে বেড়াচ্ছে আদবানী অশীতিপর বৃদ্ধ, তিনি কর্মক্ষম নন। বাস্তবে তাঁর শারীরিক সক্ষমতা তাঁর থেকে ২০-৩০ বছরের তরুণ রাজনীতিকের থেকেও ঢের বেশি। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী একজন তারকা-প্রশাসক। তাঁর নেতৃত্বে গুজরাটের অর্থনীতির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে একথা সব মহলেই স্বীকৃত। ভারতের বাইরেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ২০০২ সালের গুজরাট হিংসার অছিলায়— তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বাহিনী রংটিন করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁকে কালিমালিপ্ত করার বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ফলে সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষীদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সীমিত। এমন পরিস্থিতির সদর্থক মোকাবিলা করতে হলে আদবানীকে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ও নরেন্দ্র মোদীকে উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরাই বিজেপির সবথেকে যুক্তিসঙ্গত অবস্থান হওয়া উচিত। কালক্রমে মোদী আদবানীর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে তাই বলা প্রাসঙ্গিক যে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েরই জনমনে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত যাতে দেশ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার পায়— যে সরকার দেশকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরতে সক্ষম। একই সঙ্গে আমাদের শক্তিধর রাজ্য সরকার গড়ে তোলাও সমান জরুরী যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধারণাটি প্রবাহমান থাকে। দেশের সংবিধান প্রণেতারাও সংবিধানে এমন সংস্থানই রেখে গেছেন। তাই ভারসাম্য রক্ষা করাটা একান্তই জরুরি। ▯

(লেখক জম্মু-কাশ্মীর ও অসমের প্রাক্তন রাজ্যপাল)

কর্ণাটকে চমকপ্রদ সাফল্যের সঙ্গে হয়ে গেল ২০১২ ‘বিশ্ব বিনিয়োগকারী সম্মেলন’

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ৭.৬ লক্ষ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ লগ্নী ও সেই সুবাদে ১৫ লক্ষ চাকরির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করে গত ৮ জুন ২০১২-তে শেষ হলো কর্ণাটক সরকার আয়োজিত ‘গ্লোবাল ইনভেস্টরস মিট (GIM-2012)’। সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে কর্ণাটকে, রাজ্য সরকারের তরফে সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা হলেও সরকারের মুখে হাসি ফুটিয়ে লগ্নীর প্রস্তাব প্রায় ১.৬ লক্ষ কোটি টাকার বাড়তি অঙ্কে পৌঁছে যায়। সংবাদসূত্র অনুযায়ী কিছুদিন ধরেই আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, মেক্সিকো, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান এমনকি দেশের মুম্বাই, দিল্লী কোয়েম্বাটুরের মতো শিল্প সমৃদ্ধ শহরে যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে একের পর এক ‘রোড শো’-র মাধ্যমে সরকার বিদেশ ও স্বদেশ উভয়েরই শিল্পমহলকে কর্ণাটকে আসতে আকৃষ্ট করেছে। সারা বিশ্বে জাঁকিয়ে বসা অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে এমন বড় আকারের শিল্প বিনিয়োগ সফলভাবে টেনে আনতে পারায় কর্ণাটক সরকার অবশ্যই বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।

প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী অটোমোবাইল থেকে এয়ারোস্পেস, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জৈব প্রযুক্তি ও ওষুধপত্র, কেমিক্যালস ও পেট্রোকেমিক্যালস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে তথ্য প্রযুক্তি, খনি ও খনন, পরিবহন পরিকাঠামো থেকে ভ্রমণ এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই বিনিয়োগগুলি বাস্তবায়িত হবে। এই মর্মে বিশ্বের নানান দেশের শিল্পপতি তাঁদের ইচ্ছা ও দায়বদ্ধতার কথাই শুধু ব্যক্ত করেননি, তাঁরা কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে MOS এবং ‘এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট’সহ চুক্তি করে ফেলেছেন। ব্যাঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশনাল এক্সজিবিশন সেন্টারে এই চুক্তিপত্রগুলি স্বাক্ষরিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম-মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় বিনিয়োগের সম্ভাব্য বিপুলতা দেখে বলে ফেলেন, মনে হচ্ছে কর্ণাটক এখন সফল গুজরাট মডেলেই অনুসরণ করছে।

এই সম্মেলনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ৭.৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের উপরন্তু আরও ১.৬ লক্ষ কোটি

কর্ণাটকের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া

টাকা সংগৃহীত হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ‘এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট’র রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ। প্রস্তাবিত বিনিয়োগের স্থানগুলি এবার কেবলমাত্র ব্যাঙ্গালুরু শহরকেন্দ্রিক নয়, এগুলি ছড়িয়ে পড়বে কর্ণাটকের বিভিন্ন প্রান্তে। এতে প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানও হবে গোটা রাজ্য জুড়ে।

৭ জুন শুরুর দিন সম্মেলন মঞ্চটি দেশ বিদেশের খ্যাতিমান শিল্পদ্যোগীদের উপস্থিতিতে হয়ে উঠেছিল একটি যথার্থই বাণিজ্যিক প্রেরণাস্থল। ছিলেন টয়াটো জেনারেল মোটরস, ইনফোসিজম, জিন্দাল গ্রুপ, টাটা স্টিলের মতো প্রথম শ্রেণীর দেশীয় শিল্পদ্যোগীদের সঙ্গে নানান বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধি বা তাদের ভারতীয় অংশীদারা।

সম্মেলন শেষে উন্নয়নকে আরও সংহতি দিতে ও চাকরির ক্ষেত্রেকে সম্প্রসারিত করতে রাজ্য সরকার আই সি টি গ্রুপ ২০২০ নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা তৈরি করেছে। সংস্থার কর্ণধার হচ্ছেন মণি পাল গ্লোবাল এডুকেশন সার্ভিসের চেয়ারম্যান টি ভি মোহন দাস পাই। এই গ্রুপের লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ ৪ লক্ষ কোটি টাকা ও বাড়তি ১২ লক্ষ রোজগারের সম্ভাবনা তৈরি করা। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের কাছে ৫০ একর জমির ওপর একটি বিশেষ ‘অর্থনৈতিক শহর’ তৈরী করার সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া। এই ধরনের প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে এই প্রথম। মোট ১০০ একর জমির মধ্যে প্রস্তাবিত চাল্লাশের এলাকায় স্বনামধন্য ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসটি তৈরি করার প্রস্তাব রেখেছে।

উল্লেখিত ব্যাপক শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তবে আরও ত্বরান্বিত করতে কর্ণাটক সরকার তাদের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি করেছে। বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করতে এই কমিটির কাজ হবে প্রতি সপ্তাহে মিটিং করে বিনিয়োগকারীদের সুবিধে-অসুবিধে শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করা। এর পরেও প্রতি মাসে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই কমিটির কাজ পর্যালোচনা করা হবে। কোনও বিভাগের কোনও আধিকারিকের কাজে শ্লথতা থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়াও প্রতিটি বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের তরফে সাহায্য করতে মুখ্যমন্ত্রী একজন করে ‘সম্পর্ক স্থাপন আধিকারিক’ নিযুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন।

এর পরেও শিল্পপতিরা কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁরা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মোবাইল নম্বরে ফোন করার স্বাধীনতাও পাবেন। বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করে রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের স্থায়ী সুযোগ তৈরি করতে সরকার যে কতটা দায়বদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প এই পরিকল্পনাগুলি তারই প্রমাণ যা দেশের অন্য রাজ্যগুলি ভাবতে পারে। □

উত্তরপ্রদেশে সপা সরকারের ১০০ দিন

মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ পরিণত 'অপরাধ যাদব'-এ

শংকর পাল।। উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব সরকারের একশ' দিনের কাজকর্মের ভিত্তিতে লোকে তার নামকরণ করছেন 'অপরাধ যাদব' বলে। 'নেতাজী' মুলায়ম এখন দিল্লীর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সেজন্য বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেই যুবরাজ অখিলেশকে লক্ষ্ণৌ'র রাজ্যপাটে বসিয়ে দিয়েছেন।

একশদিনে রাজ্যে যেভাবে অপরাধ ও অপরাধীদের রমরমা বেড়েছে তা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার মতো। সবমিলিয়ে যেন এক অরাজক পরিস্থিতি। অথচ সমাজবাদী পার্টির একক গরিষ্ঠতা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতা দখলের মূল কারণই ছিল— মায়াবতীর আমলের নৈরাজ্য থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দেওয়া। এক ভ্রষ্টাচারমুক্ত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে রয়েছে। মায়াবতীর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে থানায় সামূহিক বলাৎকারের মতো ঘটনা ঘটেছিল। অপহরণ, হত্যা, লুটপাট তো সাধারণ ঘটনা।

প্রথম চোটেই অখিলেশ যাদবের প্রথম একশদিনের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ একেবারে হতাশ। ১৫ মার্চ, ২০১২ উত্তরপ্রদেশের যুবক মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সরকার ক্ষমতায় বসেছিল। এবছরের ২২ জুন সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে। যদিও মাত্র ১০০ দিনেই একটি রাজ্য সরকারের মূল্যায়ণ করা ঠিক হবে না, তা সত্ত্বেও সরকারের নীতি ও সদিচ্ছার কিছু দিশা ও ইঙ্গিত তো পাওয়া যেতেই পারে।

এখনও রাজ্যে সরকারের কোনও নির্দিষ্ট দিকনির্দেশ দেখা যাচ্ছে না। ঘটনাপ্রবাহ অখিলেশ-পিতা মুলায়মের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়কার নৈরাজ্যের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। অনেক জঘন্য অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সরকার ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখেই সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা নিচ্ছে। ভ্রষ্টাচার আর গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে ভোট চেয়ে বাজিমাৎ করেছিল সমাজবাদী পার্টি। জয়, একক গরিষ্ঠতা--- সবই হয়েছিল। বিগত একশদিনে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। অখিলেশ মুখ্যমন্ত্রীর গদীতে বসে বড় মুখ করে ঘোষণা করেছিলেন, 'অপরাধ দমন করা হবে'। কিন্তু এখন এক সি এম ও-র হত্যাকাণ্ড এবং অন্য এক ডেপুটি সি এম ও-র জেলে রহস্যময় মৃত্যুর কিনারা হয়নি। এই ঘটনায় ২২ জন ডাক্তারকে সাসপেন্ড করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কারণ কয়েকজন ডাক্তারের অনেক 'উপর স্তর' পর্যন্ত 'হাত' আছে। ভ্রষ্টাচারের উপর লাগাম কষার প্রতিশ্রুতিও কথার কথা থেকে গেছে। মায়াবতীর আমলে বারোটি চিনিকল জলের দামে বিক্রির তদন্তও হিমঘরে চলে গিয়েছে। লক্ষ্ণৌ বিধানসভায় একজন শাসক দলেরই বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশের জবাব— 'ওই তদন্ত করানো হবে না।'

বলা হয়েছিল পূর্ববর্তী বসপা (মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী) সরকারের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে। রূঢ় বাস্তব হলো, মায়াবতীর বাংলো সাজাতে পাঁচবছরে যে ৮৫ কোটি টাকা নয়ছয় করে খরচ করা হয়েছে তার তদন্ত প্রক্রিয়াও বন্ধ করা হয়েছে। তরুণ মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ দায়িত্ব নিয়েই বলেছিলেন— বহুজন সমাজের স্বাভিমান রক্ষার নাম করে স্মারক বসিয়ে যে সব জায়গা জুড়ে রাখা হয়েছে সেখানে কলেজ, হাসপাতাল তৈরি করা হবে। ওই ব্যাপারে সরকার এখন মৌনীবাবা সেজে গেছেন। বলা হয়েছিল--- দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাক্তন মন্ত্রীদের তদন্ত করবে বড় কোনও তদন্ত সংস্থা। লোকায়ুক্ত তো ইতিমধ্যেই দুজন মন্ত্রীর ভ্রষ্টাচার নিয়ে সিবিআই তদন্তের অনুমতিও দিয়েছে। সরকার কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। কেবলমাত্র কেন্দ্র সরকারকে সিবিআই তদন্তের জন্য সুপারিশ করলেই হলো। সেটাও হয়নি। লোকায়ুক্ত মায়াবতী সরকারের দুই মন্ত্রী--- নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকী এবং অযোধ্যা পালের সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেও ছিল। কিন্তু একমাস যাবৎ ফাইল পড়ে আছে। সোজা কথা, লোকে বলছে 'ডাল মেঁ কালা হ্যায়'।

ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে সরকার একটাই আইন বিধানসভায় পাস করিয়েছে। যদিও বিধান পরিষদে মায়াবতীর দলের গরিষ্ঠতা থাকার জন্য তা সেখানে পাশ হয়নি। সেটা হলো— মায়াবতীর আমলের চাকরিতে পদোন্নতিতেও সংরক্ষণ পদ্ধতি বদলে দেওয়া। এখন তা বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। অপরপক্ষে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা মুসলমান মেয়েদেরকে তিরিশ হাজার টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। মুসলিম কবরস্থানের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁতিদের (বেশিরভাগই মুসলমান) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল-এর জন্য এককালীন টাকা দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসবাদে যুক্ত থাকার অভিযোগে কারাগারে বন্দী মুসলমান যুবকদের ছেড়ে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত পাকা। সব মিলিয়ে সরকার অপরাধ দমনের পরিবর্তে প্রথম একশ দিনে ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করে পুষ্ট করার রাজনীতিই করে চলেছে।

অপরাধের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ

ঘটনা	২০১০	২০১১	২০১২*
বলাৎকার	২২৮	৩৮৪	৪৭২
ডাকাতি	৪০	৫২	৭০
অপহরণ	১৪০৭	১৮০৩	২২০১
লুট	৪৮৩	৪৮৩	৬৯০
হত্যা	৮৮৮	১০১৪	১১৪৯
তোলাবাজি	১৫	১১	১৬
দাঙ্গা	৭৭১	১০৪১	১২৩৬

* (অখিলেশের প্রথম আড়াই মাস)

সূত্র : পাঞ্চজন্য-৮ জুলাই-২০১২

অসম চুক্তির ২৬ বছর পরেও অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে একটিও ফ্ল্যাডলাইট লাগানো হয়নি

বাসুদেব পাল ॥ ঐতিহাসিক অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিদেশী সনাক্তকরণ ও বিতাড়ন তো দূরের কথা, সামান্য কাজটুকুও যেমন—

মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা

অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া কিংবা সীমান্ত বরাবর রাতে নজরদারি করার জন্য কমপক্ষে ফ্লাডলাইট লাগানো—এখন অবধি কোনওটাই হয়নি। প্রয়াত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক 'অসম চুক্তি-১৯৮৫', যা তৎকালীন কেন্দ্র সরকার, অসম রাজ্য সরকার এবং অসমের বৃহত্তম ও প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন 'অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা 'আসু' নেতৃত্বের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৭৮ থেকে ওই সময় পর্যন্ত আসু'র প্রচণ্ড আন্দোলনে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ত। এমনকী লোকে কার্ফু অমান্য করে রাস্তাঘাট অবরোধ করত। আন্দোলনকারীদের মূল দাবীই ছিল, অসমে ঢুকে পড়া বাংলাদেশী ও বিদেশী নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়ন, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শীঘ্রাতিশীঘ্র কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া ও নিশ্ছিদ্র পাহারার ব্যবস্থা করা যাতে আর কেউ অসমে ঢুকে পড়তে না পারে।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হলো, এই ২০১২ সালের অর্ধেক পার হয়ে গেলেও এখনও অবধি শুধুমাত্র অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ হয়নি, বন্ধ হয়নি বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ। ওয়াকিবহাল মহলের মতামত অনুযায়ী, শুধুমাত্র অসমেই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাটা পঞ্চাশ লক্ষের বেশি। এটাও কয়েক বছর আগেকার হিসাব (অনুমান)। বাংলাদেশ থেকে অসমে অনুপ্রবেশ করে নাগরিক হয়ে যাওয়া, বিয়ে-সাদী করে এখানেই ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া এবং সবশেষে ১৯৯৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো ঘটনা ঘটেছে। ওই বাংলাদেশীর নাম কামালুদ্দিন। তাকে গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে অসম থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে দিয়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কখনও কোনও মঞ্চে স্বীকার করেনি যে, একজনও বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। তবে কামালুদ্দিন তার বংশধরদের ভারতে রেখে গিয়েছে। ভারতের সংবিধান অনুসারে জন্মসূত্রে এখন তারা ভারতীয় নাগরিক।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৪০৯৫ কিলোমিটার লম্বা। এই দৈর্ঘ্যের মধ্যেই রয়েছে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের ভারত ও বাংলাদেশ উভয়দেশের মধ্যেই পরস্পরের ছিটমহল রয়েছে। ছিটমহল দীর্ঘদিনের এক উদ্ভট ও প্রকট সমস্যা। সম্প্রতি এই সমস্যা সমাধানের একটা সূত্র বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তা শেষপর্যন্ত কতটা কার্যকর হবে, এদেশের স্বার্থ কতটা রক্ষিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অনুপ্রবেশ অসম ও পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্যকে বদলে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাবিত করেছে

পুলিশ হেফাজতে ধৃত অনুপ্রবেশকারীরা। (ফাইল চিত্র)

রাজনীতিকে, ক্ষমতালোভী সংখ্যালঘু তোষণকারী রাজনৈতিক নেতাদের। গজিয়েছে জেহাদি-জঙ্গি গোষ্ঠী এবং মদতপুষ্ট ও মদতদাতা রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য চলে যাচ্ছে ওইসব দলের নেতাদের হাতে। যে মৌলিক কারণে দেশভাগ হয়েছিল (হিন্দুভারতে মুসলমানরা নিরাপদে থাকতে পারবে না) তা আজ বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় জেলায় এবং অন্যত্র ছোট ছোট এলাকায় মাথাচাড়া দিচ্ছে ‘মিনি পাকিস্তান’। অসমের উদালগুড়ি থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, দুই ২৪ পরগণার বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গিয়েছে অনেক নমুনা। তা সে উদালগুড়িতে পাক-পতাকা তোলাই হোক, আর কুলপিতে থানা ও মগরাহাটে পুলিশের উপর আক্রমণ অথবা জয়নগর-কুলতলির গ্রামে হিন্দুদেরকে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করা, হিন্দু বৌ-ঝিদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করার মতো ঘটনাই হোক। প্রায় নিত্যদিনের সংবাদ--- চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ, চোখে পড়ছে হতভাগ্য হিন্দুদের পোড়া ঘরবাড়ি।

অসম-চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ই ছিল— অসম-বাংলাদেশ সীমান্তের শতছিদ্র সীমান্তকে সীল করে অনুপ্রবেশকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া বা প্রতিরোধ করা। কিন্তু এখনও রাজ্যের অনেক এলাকাতে সীমান্ত উন্মুক্ত রয়েছে। কেন্দ্র সরকার অথবা অসম রাজ্য সরকার কেউই অনুপ্রবেশের মতো দেশ-বিরোধী বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি।

সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১১-১২-র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে কেন্দ্র সরকার প্রথম দফায় অসমে ১৫২.৩১ কিমি ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য অনুমোদন করেছিল। এখনও পর্যন্ত ১৪৯.২৯ কিমি বেড়া দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় অনুমোদিত ৭৭.৭২ কিমি-র মধ্যে ৭২.২৭ কিমি কাজ অবশ্য পুরো হয়েছে।

সব মিলিয়ে কেন্দ্র অসমে মোট ২৩০.০৩ কিলোমিটার বেড়া দেওয়ার অনুমোদন করেছিল। তারমধ্যে এখনও অবধি কাজ শেষ হয়েছে ২১১.৫৬ কিমি। বাকি পড়ে রয়েছে ৮.৪৭ কিলোমিটার। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৩৪৩৬.৫৯ কিমি এলাকায় বেড়া দেওয়ার কথা। তার মধ্যে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে ২৭৬০.১২ কিমি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেড়া রীতিমতো অসুবিধাজনকও বটে। কেননা, সীমান্তের ১৫০ মিটারের মধ্যে রয়েছে জনবসতি, নদী, উঁচু-নীচু অসমতল জমি। সীমান্তবাসী জনতা জমি অধিগ্রহণে আপত্তি জানিয়েছে বলে বেড়ার কাজে বিলম্ব— এমনটাই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিবরণে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, “অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া অনেককাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিপরীত আবহাওয়া এবং ক্রমাগত জলের তোড়ে।”

বেড়ার কাজের থেকেও সীমান্তে ফ্লাডলাইট লাগানোর কাজে ভয়ানক শম্বুকগতি দেখা যাচ্ছে। ২৮৪০ কিমি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে পাঁচটি রাজ্যেই ফ্লাডলাইট লাগানোর কথা। এজন্য কেন্দ্র সরকার ১৩২৭ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে শুধু অসমে ২০৮.৭৪১ কি.মি. সীমান্তে ফ্লাডলাইট লাগানোর কথা। আজ পর্যন্ত কোনও রহস্যজনক কারণে একটিও আলো (ফ্লাডলাইট) লাগানো হয়নি। কেন্দ্র সরকার এইকাজের বরাত দিয়েছে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ (PWD)-কে। বিষয়টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি। এরফলে অনুপ্রবেশকারী এবং চোরাচালানকারীদেরই যে পোয়া বারো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০০৫-এ কেন্দ্র সরকার, অসম রাজ্য সরকার এবং অসমের ছাত্র নেতৃত্ব (AASU) —ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সীমান্তে কড়া নজরদারি করার জন্যে রাজ্যের ২৭২ কিমি ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারির জন্য ফ্লাডলাইট লাগানো হবে। ২৬ বছর পার হয়েছে। একটিও লাগানো হয়নি।

এব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে আসু (অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) নেতৃবৃন্দ এবং অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদের নেতারা ফ্লাডলাইট না লাগানোর জন্য কেন্দ্র সরকারকেই প্রধানত দায়ী করেছেন। এছাড়া তারা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লীতে ঠিকমতো তদবির করা বা আগ্রহ দেখানো হয়নি বলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছে। সীমান্ত সীল করা, রাজ্যে বিদেশীদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার-এর ব্যাপারে কেন্দ্র সরকার আদৌ আন্তরিক নয়। এই প্রসঙ্গে অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদের সভাপতি মনোজ বরুয়া অসম চুক্তি রূপায়ণ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ভূমিকাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে নিন্দা করেছেন।

‘আসু’-র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেছেন, “ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত তিন বছরে সীল করা হয়, কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত হয় না— শুধুমাত্র সদিচ্ছার অভাবে। অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সীল না করা, অযথা দেরি করাতে অসমের প্রতি কেন্দ্রের প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্যাপকহারে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারী, জঙ্গি-জেহাদি ও মৌলবাদীরা অসমে ঢুকছে। বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাসের চেহারাটাও। অসম চুক্তিরূপায়ণ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কেন্দ্রকে কোনওরকম চাপ না দেওয়াটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের।”

অসম ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট বদলে এ আই ইউ ডি এফ।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

ভারতের কমিউনিস্টদের 'আঁতুড়ঘর' জে এন ইউ-তে 'বিপ্লব'

অজিত কুমার বিশ্বাস

প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, নেপালের মাওবাদীনেতা প্রচণ্ডদের রাজনৈতিক উত্থানের 'আঁতুড় ঘর' জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জে এন ইউ)। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন করা নিয়ে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে গেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর মধ্যে। নেহরু-ইন্দিরা গান্ধী পরিবারকে চিরকাল কমিউনিস্টরা মদত দিয়েছে এবং অপরদিকে কংগ্রেসও সবসময় কমিউনিস্টদের মদত দিয়েছে। গত শতকের ছয়ের দশকে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি যখন খুবই শক্তিশালী তখন মস্কোতে রাশিয়া লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিল। এফ্রো-এশিয়ান দেশগুলো থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কমিউনিস্ট তৈরি করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। কয়েক হাজার ছাত্র ছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভারতে ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন রুশ-ভারত চুক্তির ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় এই জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯ সালে রাশিয়ার সম্পূর্ণ সহযোগিতায় গড়ে উঠল এই বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রে তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন কমিউনিস্ট নুরুল হাসান। দক্ষিণ দিল্লীর এই সুন্দর অঞ্চলটা রাশিয়ার কমিউনিস্টদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। গড়ে উঠল বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল 'Nine Schools Consisting of 24 Centres of Studies!'

জে এন ইউ ১৯৬৯ সালে যখন শুরু হয় তখন শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৩০০ আর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০০০। এই সব ছাত্র এবং শিক্ষক সারা ভারতের কমিউনিস্টদের বাড়ি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সরকার চালাচ্ছে কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিস্ট তৈরির কারখানায়

জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি

একটিও কংগ্রেস ছাত্র বা শিক্ষক ছিল না। ২০০১—২০০২ সালে জে এন ইউ-তে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৪২৮০ জন। শিক্ষক ছিল ৪০৪ জন এবং অশিক্ষক কর্মচারী ছিল সবাই কমিউনিস্ট।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সাল থেকে কমিউনিস্টদের শাসন চলছে। ২০১১ পর্যন্ত তৃণমূল আসার আগে কেবল বাংলায় নয়, দিল্লীতেও শিক্ষা সাহিত্য ইতিহাস, সংস্কৃতি নৃত্যনাট্য সব বিভাগই আজও চালাচ্ছে কমিউনিস্টরা। দিল্লীতে জে এন ইউ তৈরি হয়েছে কংগ্রেস কমিউনিস্ট যৌথ উদ্যোগে। এই রাজ্যে যাই হোক, দিল্লীতে কিন্তু কংগ্রেস শাসন করবে আর কমিউনিস্টরা মদত দেবে।

তাই তো প্রকাশ কারাত আর সীতারাম ইউচুরিদের জে এন ইউ থেকে তৈরি করা হয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই কমিউনিস্টদের ছাত্রসংগঠনের তরফে এখন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি প্রার্থী প্রণব মুখার্জীর বিরোধিতা করা হচ্ছে। তা কোনওক্রমেই বরদাস্ত করা হবে না।

তাই সীতারাম, প্রকাশ, ঋতব্রতরা রে রে করে ছুটে গেছে জে এন ইউ-তে এই কংগ্রেস বিরোধিতাকে সামাল দিতে। তাই জাতীয়তা রক্ষার স্বার্থে কেবল বাংলা নয়, সারা ভারত থেকে এই কংগ্রেস-কমিউনিস্ট জুটিকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হটাতে হবে বলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা মনে করেন। তবেই দেশের মঙ্গল হবে, বাংলারও মঙ্গল হবে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বাঁকুড়ায় কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ৮ জুলাই বাঁকুড়ায় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। জেলার শতাধিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ১১০০ ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এঁদের মধ্যে একাধিক স্থানাধিকারীও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ছিলেন খৃশ্চান কলেজের ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান গৌতমবুদ্ধ সুরাল। এছাড়াও বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের সুপার ডাঃ পঞ্চানন কুণ্ডু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দ্বীপায়ন পট্টনায়ক প্রমুখ। পরিষদের বর্তমান রাজ্য সম্পাদক সুবীর হালদারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তিন প্রাক্তন রাজ্য-সম্পাদকও, ডাঃ সুভাষ সরকার, আইনজীবী শান্তনু সিনহা ও আইনজীবী বিশ্বেশ্বর সিংহ (বর্তমান রাজ্য সহ-সভাপতিও) এবং পরিষদের বাঁকুড়া বিভাগ প্রমুখ পার্থসারথি কুণ্ডু।

আসানসোলে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

আসানসোল জেলা সেবা বিভাগের উদ্যোগে গত ১৭ জুন ইছাপুর গ্রামে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা প্রত্যেকেই শিশু সংস্কার কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ইছাপুর অঞ্চলে ২০০১ সালে একটি সেলাই কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে সংস্কার কেন্দ্র, পাঠদান কেন্দ্র, অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চিকিৎসা কেন্দ্র, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদির মাধ্যমে মোট ১৬টি সেবা কেন্দ্র চলছে। সেবা বিভাগের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলেই দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক পাশ করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাকর মণ্ডল যিনি দুর্গাপুর শহরের একটি প্রখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর বক্তব্যে এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পদক ও শংসাপত্র তুলে দেন।

অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ গৌতম পাল ছাত্র-ছাত্রীদের সেবাকাজে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। মোট ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মলয় কালী।

ঠাকুরনগরে বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের রক্তদান

গত ৮ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগরে সিমুলপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট (বারাসাত)-এর উদ্যোগে এবং সমাজ সেবা ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ)-র সহযোগিতায় রক্তদান শিবির হয়ে গেল। মোট ৩৫ জন রক্তদান করেন। সকল রক্তদাতাকেই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে সহযোগী ছিলেন ঠাকুরনগর প্রগতি সঙ্ঘ, ঠাকুরনগর ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম, হাবড়া নবকল্লোল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের বারাসাত জেলা সেবা প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, একল বিদ্যালয় অভিযানের অঞ্চল প্রমুখ প্রভাস মুখার্জী, আরোগ্য প্রমুখ কণিকা রপ্তান, সুব্রত ভৌমিক, সুকুমার নাথ, শাশ্বতী নাথ প্রমুখ।

পরলোকে কাশীশ্বর সাহা

হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকার একান্ত আপন দীর্ঘদিনের বিক্রয় প্রতিনিধি কাশীশ্বর সাহা। বহু বাধা-বিপত্তি ও শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় পাঁচ শতাধিক স্বস্তিকা তিনি পৌঁছে দিতেন। স্বস্তিকা ছিল তাঁর দিনরাতের একান্ত সাধনা।

গত ৬ জুলাই বনগাঁ মহকুমার মছলন্দপুরে নিজ বসভবনে প্রায় আটষট্টি বছর বয়সে তিনি গত হয়েছেন। তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণে স্বস্তিকা পরিবার গভীর শোকাহত। অত্যন্ত বিনয়ী, মৃদুভাষী সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের অধিকারী এই মানুষটির প্রয়াণ স্তব্ধ করে দিয়েছে সকল পরিচিতজনকে। তিনি রেখে গেলেন— স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন এবং অগণিত গুণমুগ্ধকে। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে পরম মঙ্গলময়ের কাছে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়েছে।

***

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পর্কে প্রমুখ উদয় শঙ্কর সরকারের মাতৃদেবী শান্তি রাণী সরকার গত ২৭ মে ৮৬ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে সাড়ম্বরে আয়োজিত ‘কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ জুলাই দেশের বৃহত্তম ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে আয়োজিত হলো ‘কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা’। কলকাতা শাখার এই সংবর্ধনা এবার দশমবর্ষে পদার্পণ করলো। ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে কলকাতার একশ’রও বেশি নামী-দামি স্কুল থেকে সাতশো জনকে ওইদিন সংবর্ধিত করা হয়। প্রসঙ্গত, ৯ জুলাই পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই দিনটিকে ‘জাতীয় ছাত্র দিবস’ হিসেবে প্রতিবছরই পালন করে ছাত্র-সংগঠনটি। তবে এবারের বিশেষত্ব বিদ্যার্থী পরিষদ যাঁকে তাদের ভাবগুরু বলে গ্রহণ করেছে সেই বিবেকানন্দের জন্ম-সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে স্বামীজী’র বিভিন্ন কাট আউটে ছেয়ে গিয়েছিল অনুষ্ঠান চত্বর। চিরাচরিত প্রথা মেনেই বিবেকানন্দ ও সরস্বতী’র মূর্তির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত উমেশ দত্ত শর্মা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্দামাননিবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ মৃণালকান্তি দেবনাথ, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিষদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক উমেশ দত্ত শর্মা। এছাড়াও ছিলেন পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি ও রাজ্য-সভাপতি রবিরঞ্জন সেন। কলকাতা শাখার সভাপতি ডঃ রমন ত্রিবেদী স্বাগত ভাষণ দেন। উমেশ দত্ত শর্মা তাঁর ভাষণে ছাত্র শক্তিকে ‘নুইসেন্স’ পাওয়ার (ক্ষতিকারক শক্তি) নয়, ‘নেশনস’ পাওয়ার (জাতির শক্তি) বলে অভিহিত করেন। দেশের পুনর্গঠনে ছাত্র-শক্তির উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা তিনি ধরেন। তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, সুদূর কাশ্মীরের লে থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাটের দূরতম প্রান্ত থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্তিম প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যার্থী পরিষদের কাজ বিস্তৃত। দেশের অন্ততঃ ৪০০ স্থানে এবিভিপি-র সক্রিয় শাখা চলছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিয়ে শাখার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ হাজার। দেশের সবক’টি জেলায় পরিষদের কোনও না কোনও কাজ চলছে। সদস্যতাও ছুঁয়েছে ১৭ লক্ষ। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই শুধু দেশের মধ্যে নয়, বিশ্বের মধ্যেও বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হবার দাবি রাখে বিদ্যার্থী পরিষদ বলে তিনি মন্তব্য করেন। ডাঃ দেবনাথ তাঁর ভাষণে মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের তত্ত্ব ‘পানিশমেন্ট (শাস্তি) ও রিওয়ার্ড (পুরস্কার)’ তুলে ধরে বলেন, ভাল কাজ করলে পুরস্কার না দিলে উৎসাহ আসে না। সেদিক দিয়ে পরিষদের এই ‘রিওয়ার্ড’-এর মূল্য সম্পর্কে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করান তিনি। অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেনের বক্তব্য ছিল, সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই যুবকরা অধিক অনুপাতে (৫৫ : ৪৫) উপস্থিত রয়েছেন। আর এই যুবকদের মধ্যে বেশিরভাগই যেহেতু ছাত্র-ছাত্রী, তাই তাদের শারীরিক, মানসিক ও চিন্তা শক্তিকে দেশের কাজে লাগানো গেলে পরিষদের ‘ছাত্রশক্তি- রাষ্ট্রশক্তি’র তত্ত্ব সাফল্যলাভ করবে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি রম্যজ্যোতি সরকার এবং ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন অপর সহ-সভাপতি অজিত সাহু।

বন্দেমাতরম্-এর সময়।

মুসলমান কন্যার সংস্কৃত-প্রেম

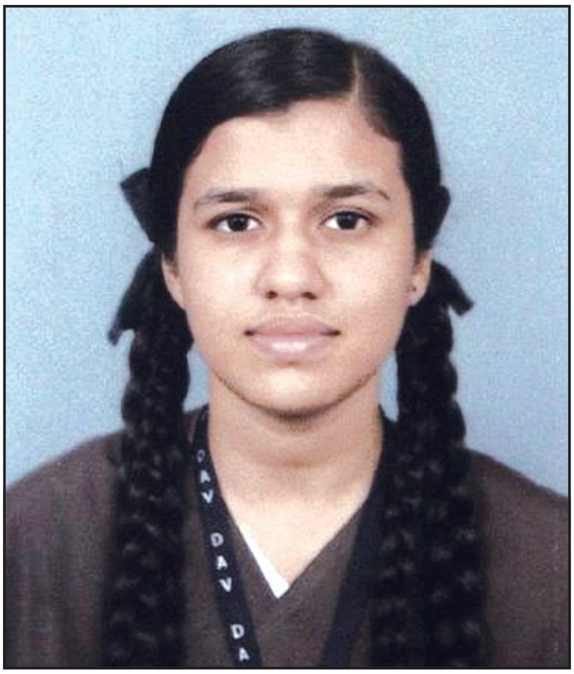

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মোগাপ্পায়ার একটি ছোট্ট আধা মফস্বল শহর। সেখানকার ডি এ ভি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলটি ততোধিক ছোট। তবে আপাতত এই ছোট্ট স্কুলটি শুধু তামিলনাড়ুতেই নয়, সর্বভারতীয় সংবাদ শিরোনামে। কারণ সেখানকারই একটি ছোট্ট মেয়ে আনজালা বেগম এবার মাধ্যমিকে ৫০০-র মধ্যে ৪৯৭ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, আনজালা যে সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছে সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার চল যে খুব বেশি নয় সেটা সকলেরই জানা। আর সেদিক দিয়ে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে টপকে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের এই মেয়েটি সংস্কৃতে একশ'র মধ্যে একশ পেয়েছে আর বলা বাহুল্য সংস্কৃত বিষয়ে তার সমকক্ষ এবছর আর কেউ হতে পারেনি।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও শুধু আনজালা-ই নয়, তার ভাই গুলসার আহমেদও ২০০৮-এ রাজ্যের সংস্কৃতে সেবার তালিকায় অন্যতম ছিল। বোঝাই যায়, মৌলবাদীদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে এই মুসলমান পরিবারটি তাদের পারিবারিক ধারায় সংস্কৃত চর্চাকে অব্যাহত রেখেছে। সংস্কৃত ছাড়াও অঙ্ক এবং বিজ্ঞানেও একশ'য় একশ পেয়েছে আনজালা। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন ওই দু'টি বিষয়েও রাজ্যে সেরা সে। সংস্কৃতকে 'ধর্মশিক্ষা'র অন্তর্গত করে যে হিন্দুবিদ্বেষী 'ধর্মধ্বজী'রা এতদিন বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ এই সুপ্রাচীন ভাষাটির বিরোধ দেখিয়ে আসছেন, আনজালার এহেন ফলাফল তাদের মুখের মতো জবাব দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু মার্কশিটে স্কোর করার তাগিদে নয়, প্রাত্যহিক জীবনচর্যাতেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ জন্মেছে আর এর ফলশ্রুতিতেই যে এহেন চমকপ্রদ রেজাল্ট তা জোর গলায় জানাচ্ছে মুসলমান পরিবারের এই একরত্তি মেয়েটি। তার বক্তব্য, ''আমি প্রতিদিন ধ্যান করার চেষ্টা করি, বিশেষত, পরীক্ষার সময়। আমি স্কুলের যোগের ক্লাসেও যাই সপ্তাহে দু'বার। এতে মনসংযোগ এবং পড়াশুনোর বিষয়টির ওপর 'ফোকাস' দুই-ই বাড়ে।'' সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রসঙ্গে সে জানিয়েছে, ''আমি সংস্কৃত-কে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নির্বাচিত করি ২০০৮ থেকে। যে বছর আমার দাদা সংস্কৃতে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় হন।'' সংস্কৃত শিক্ষিকা শ্রীধর ভেঙ্কটরামানীকে তার এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছে আনজালা।

সোস্যাল স্টাডিজে ৯৯ এবং ইংরেজিতে ৯৮ পেয়েছে আনজালা বেগম। বায়োলজি নিয়ে পড়াশুনো শুরু করেছে সে। ইচ্ছে ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হবে। আনজালার বাবা আব্দুল হামিদ, পেশায় আই সি এফের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তার ছেলে-মেয়ের এই সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী তথা আনজালা গুলসারের মা সায়রা বানুকে। যিনি গৃহবধূ, সংসারের সব হ্যাপা সামলেও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দিকে নজর দিয়েছেন আগাগোড়াই। সায়রা নিজেও সংস্কৃততে দক্ষ। নারীর মর্যাদার দিক দিয়েও এই পরিবারটি যে সাধারণ মুসলমান সমাজের থেকে স্বতন্ত্র তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

ইউরোপীয়দের ভারত বিদ্যাচর্চা সম্ভ্রম জাগায়

অজিত কুমার বিশ্বাস

বিগত ৫০০ বছরে ইউরোপের ইংরেজ কেবল নয়, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগাল এইসব দেশের লোকেরা ভারতে এসে কেবল শাসন-ই করেনি, শোষণ লুটপাট আর নানা অত্যাচার করেছে। কিন্তু ইউরোপের কোনও কোনও বিদেশিরা চাকরি করতে বা ধর্মপ্রচার করতে এসে এদেশের সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যকে ভালওবেসেছে। এমনই ২০ জন ইউরোপীয় ভারত বিদ্যাচর্চার যারা সাধনা করেছেন, সেইসব পথিকৃৎদের সম্পর্কেই লিখেছেন সুলেখক আশিস গঙ্গোপাধ্যায়।

যে সমস্ত বিদেশী মহৎপ্রাণ মানুষ ভারত বিদ্যাচর্চাকেই তাদের জীবনের ধ্রুবতারা করে তুলেছিলেন এবং অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও এদেশের নগরে বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছেন শুধুমাত্র জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়ে সেই লব্ধজ্ঞানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে— তাঁদের অন্যতম পুরোধা পুরুষ হলেন প্যারি শহরের মনীষী আঁকেতিল দ্যুপের্ঁ (১৭৩১-১৮০৫)। সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকো সংস্কৃত থেকে উপনিষদের কিছু অংশ নির্বাচিত করে ফারসি ভাষায় তা অনুবাদ করেন। আঁকেতিল দ্যুপের্ঁ ভারতে এসে দারাশিকোর অনূদিত উপনিষদ ফারসি থেকে ল্যান্টিনে অনুবাদ করেন। ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজ সেই অনুবাদ পড়েই ভারতের বৈদিক সাহিত্যের অস্তিত্ব ও মহিমার কথা জানতে পারে। ভারতে এসে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অনেক কষ্ট করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে থেকে উপনিষদ ও আবেস্তা ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) কৃষ্ণনগরে একটি মাটির বাড়ি কিনে সেটাকে বাংলোর মতো সাজিয়ে সেখানেই সংস্কৃত শিক্ষক রামলোচনের কাছে সংস্কৃত শেখেন।

আত্মসমালোচনার ঢঙে জোন্স বলতেন, 'ভারতে যখন বিক্রমাদিত্যের মতো রাজা ছিলেন। কালিদাসের মতো শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ পরিপূর্ণ 'নবরত্ন' সভার অস্তিত্ব, ইংল্যান্ড তখন পরিপূর্ণ প্রায় মূর্খ এবং অক্ষরজ্ঞানহীন একদল মানুষের সমাবেশ।' 'কালিদাসের লেখা অনুবাদ করে আমি আমার স্বদেশবাসীকে বোঝাতে চাই যে এখানকার সমাজ এবং মানুষদের প্রতি আমাদের অনেক সমীহ থাকা উচিত কারণ আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ঐতিহ্যসম্পন্ন এই ভারতীয় জাতি।'

চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯-১৮৩৬) সংস্কৃত থেকে ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লন্ডন থেকে গীতার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওয়ারন হেস্টিংস গীতার ভূমিকায় লিখলেন— 'গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহৎ অংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তা দ্বারা গীতা সাহিত্য জগতে এক

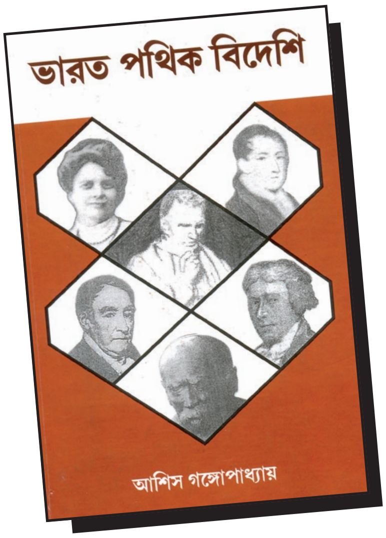

অভুতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে'।

হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭) জন্ম লন্ডনে চাকরি নিয়ে কলকাতা আসেন। সংস্কৃত চর্চা করেন। আরবি শিখলেন। তিনি আপিল আদালতের বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে বেদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ছাপা হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্পর্কেও দীর্ঘপ্রবন্ধ লেখেন। আমৃত্যু তিনি ভারত বিদ্যার সাধনা করে গেছেন।

হাঙ্গেরির ট্রান্সলভেনিয়ার জন্ম আলেকজেন্ডার সোমার (১৭৮৪- ১৮৪২) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রাচ্য বিদ্যা জানার জন্য কাশ্মীরে এলেন, সেখানে তিব্বতী ভাষা ও তিব্বত সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করলেন। কলকাতায় থেকে তিনি বুঝলেন আদি ভাষা সংস্কৃত না জানলে ভারততত্ত্ব ঠিকমতো বোঝা যাবে না। তিব্বতে অভিধান ও ব্যাকরণ ছাপা হয়ে বেরুল।

হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) কলকাতায় টাকশালে কাজ করেও সংস্কৃত ভাষায় মাতৃভাষার মতোই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভারতবিদ্যা চর্চার ফলে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। ২১ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। কলকাতার হিন্দু কলেজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলসন হিন্দু নাটকের অনুরাগী ছিলেন।

জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)— যার নামে প্রিন্সেপ ঘাট, কলকাতার টাঁকশালে চাকরী নিয়ে আসেন। যোগাযোগ হলো প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র এসিয়াটিক সোসাইটি-র সঙ্গে। আরম্ভ হলো প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার। অশোকের শিলালিপির তিনি পাঠোদ্ধার করেন। দিল্লী, এলাহাবাদের স্তম্ভলিপির তিনি পাঠোদ্ধার করেছেন।

ভারত বিদ্যাচর্চার আর এক অগ্রণী স্যার আলেকজেন্ডার ক্যানিংহাম (১৮১৪-১৮৯৩) বুদ্ধগয়া, সারনাথ শ্রাবস্তী, সাঁচী, মথুরা, কোশম্বী বৌদ্ধস্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলোর প্রাচীন গৌরবের কথা প্রভৃতি প্রথম প্রকাশ করেন।

অনেক নতুন খবর এই সব ভারত বিদ্যাবিদদের কাছে পাচ্ছি। জার্মান ভারততত্ত্ববিদ যোহান গেঅন ব্যুল্যার (১৮৩৭-১৮৯৮) আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পুঁথির পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার। কলহনের রচিত 'রাজতরঙ্গিনীর' প্রাচীনতম পুঁথির সন্ধান ব্যুলার করেছেন। ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি বইতে তিনি বলেছেন যে বেদ রচনার সময় ভারতে লিপির প্রচলন ছিল।

ভারত বিদ্যাচর্চায় রাশিয়ার পুরোধা ছিলেন আইভ্যন প্রাবোভিচ মিনিয়েভ (১৮৪০-১৮৮৯)। রাশিয়ান মানুষদের সংস্কৃত ও পালি শেখার অনেক বই রচনা করেছেন। রাশিয়ায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

২০ জন বিদেশি ভারত পথিকের ভারত বিদ্যাচর্চার সুন্দর বর্ণনা করেছেন আশিসবাবু। কিন্তু একজনকে আমরা কিছুতেই বিদেশি হিসাবে মেনে নিতে পারছি না। তিনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতকে ভালবেসে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সেবায় গুরু বিবেকানন্দের প্রত্যাশা ও নির্দেশ পূর্ণ করে ভারতের দার্জিলিং-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আশিসবাবু এই ছোট ৯০ পাতার বই-এর মধ্যে ২০ জন বিদেশি ভারততত্ত্ববিদদের কথা তুলে ধরেছেন। লেখকের কাছে আমরা এই ধরনের আরও লেখা আশা করছি।

ভারত পথিক বিদেশি—আশিস গঙ্গোপাধ্যায়
৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য-১০০

শব্দরূপ-৬৩৪ বিশাল গুপ্ত

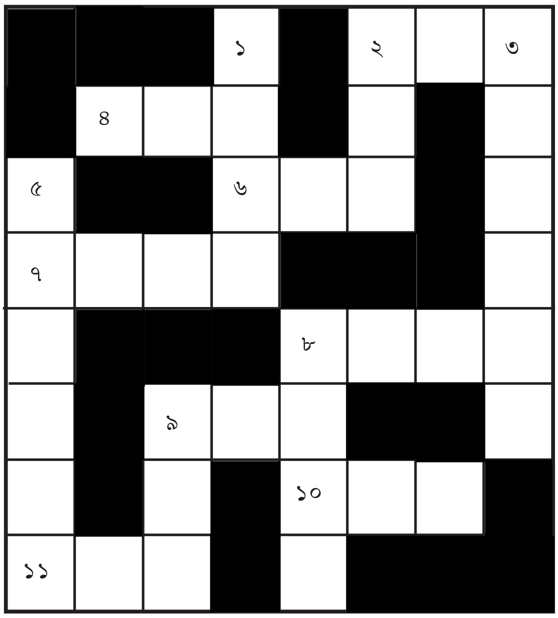

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. প্রথম ঘরে ঠ্যাং, শেষ দুয়ে পরিচিত এক পাখি, আসলে তৎসম আগুন, বিশেষণে শোধনকারী, ৪. তৎসম শব্দার্থে আকাশকুসুম, ৬. বলরামের পত্নী, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র ৭. শিবের ধনুক, ৮. পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব ও দ্রৌপদীর পুত্র, ইনিও মহারথী ছিলেন, ৯. বড়ো থালাবিশেষ, শেষ দুয়ে রাত্রি, ১০. মহাভারতোক্ত বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি, ভীম এঁকে বধ করেছিলেন, ১১. প্রতিশব্দে দীননাথ, ভগবান।

উপর-নীচ : ১. পরাগ, প্রথম দুয়ে ফুল, ২. হিমালয়ের কন্যা উমা বা দুর্গাদেবী, ৩. বিশেষণে মঙ্গলময়, শুভপ্রদ, শুভকর, চারে-পাঁচে মজুর, ৫. পঞ্চকন্যার দুই কন্যা, প্রথম তিনে ঋষি গৌতম-এর স্ত্রী, শেষ তিনে পঞ্চ পাণ্ডব-এর পত্নী, ৮. রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা ও শত্রুঘ্নের স্ত্রী, বিশেষণে যশস্বী, ৯. পরমেশ্বর।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

		জ	য়	রা	ম	বা	টি
গ	র	বা				গ	
জ		লা	ল	ন		বা	
ল	হ			ক্র		দি	
	ল		হা			নী	প
	ফ		বা	র্তা	কু		স্ব
	না				বে	তা	ল
কা	মা	র	পু	কু	র		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৩৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী।

উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—
B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ৫

একবার রাজা জন্মেঞ্জয় সর্পযজ্ঞ করেন, মহর্ষি ব্যাসদেব শিষ্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন..

জন্মেঞ্জয় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা সহকারে উপবেশন করালেন—

ক্রমশঃ

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

দশ দিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অভিযানম্

(১লা — ১০ই আগষ্ট, ২০১২)

সংস্কৃত ভাষায় কথা বলুন ....

কেবল দশদিনে। প্রতিদিন মাত্র দুই ঘণ্টা।

আপনার শিবির স্থানটি চয়ন করুন

সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক

	শিবিরস্থান	জেলা	সময়	যোগাযোগ
১	শ্রী অরবিন্দ ভবন, সেক্সপীয়র সরণি, কোলকাতা-৭১	কোলকাতা	বিকাল ৫-৭টা	৯৪৩৩০২৯৬৮২ ৯৭৩৪৮৪৮১২১
২	কল্যাণ ভবন, মানিকতলা ডাক ঘরের নিকটে	কোলকাতা-৬	সকাল ৮-১০টা	৯৭৩৪৮৪৮১২১
৩	সুরোজ্জ্বলা, চতুঃষ্পাঠী, কোলকাতা-৯৪ বাইপাস (পিয়ারলেস হাসপাতালের নিকট)	”	সকাল ১১-১টা	৯৪৩৩৪৬৯০৩২ ৯৪৩৩৪৬৯৩৪২
৪	লিপি চৌধুরীর বাড়ী, কলেজ পাড়া, কাটোয়া	বর্ধমান	সকাল ১১-১টা	৯৩৭৮৪৪৫৪২০ ৭৫০১৫৬২০৩৭
৫	হিন্দু মিলন মন্দির, দক্ষিণ বারাসাত	দঃ ২৪ পরগণা	বিকাল ৩-৫টা	৯১৪৩১৭৪৯৪৯
৬	বাদকুল্লা ইউনাইটেড একাডেমী, বাদকুল্লা	নদীয়া	সকাল ৮-১০টা	৯৭৪৯১৬১৫৪২ ৯৯৩২৯৩০৬৬৪
৭	বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, শান্তিপুর	নদীয়া	বিকাল ৪-৬টা	৯১৫৩১৯১১৪৭ ৯৯৩২৪২৮৮৮৩
৮	কেছুয়াডাঙ্গা, বিধান চন্দ্র বিদ্যানিকেতন, করিমপুর	নদীয়া	সকাল ৭-৩০-৯-৩০টা	৯৭৪৯৪৯৩৮৬১
৯	বিধান চন্দ্র বিদ্যানিকেতন, কেছুয়াডাঙ্গা, করিমপুর	নদীয়া	বিকাল ৪-৩০-৬-৩০টা	৯০০২৭১৬৩২৯
১০	শ্রীশ্রী নিগমানন্দ মঠ, হালিসহর	উঃ ২৪পরগণা	বিকাল ৫-৭টা	৯১৪৩৩৫১৮৬৭ ৯০০৭৬৫৯৪৫৬
১১	সারদা শিশু তীর্থ, মাথাভাঙ্গা	কুচবিহার	সকাল ৮-১০টা	৯০০২৮৬৩৬৭০
১২	সারদা শিশু তীর্থ, মাথাভাঙ্গা	”	বিকাল ৫-৭টা	৯৪৩৪৩৮৫৯১৮
১৩	আনন্দমার্গ মিশন, বেলপুকুর, শ্যামপুর	হাওড়া	বিকাল ৪-৬টা	৯৬৪৭৩৮৩৪১৮
১৪	পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, পাত্রসায়ের	বাঁকুড়া	সকাল ৭-৯টা	৯৭৩২০৯০৬৭৯
১৫	বালসী বালেশ্বরতলা, বালসী, পাত্রসায়ের	”	সন্ধ্যা ৬-৮টা	৯৭৩৪৭৫০২৭৫

আবাসীয় সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ ১৬—২৬ আগষ্ট, ’১২, স্থান :— শ্রীশ্রী নিগমানন্দ মঠ, হালিসহর

সত্বর আবেদন করুন —

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ : **সংস্কৃতভারতী,** দক্ষিণবঙ্গ

২৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬; ৯৮৩৬৩১৩২৫৫ / ৯৪৭৪৮১০৫৫৬

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
23 July - 2012

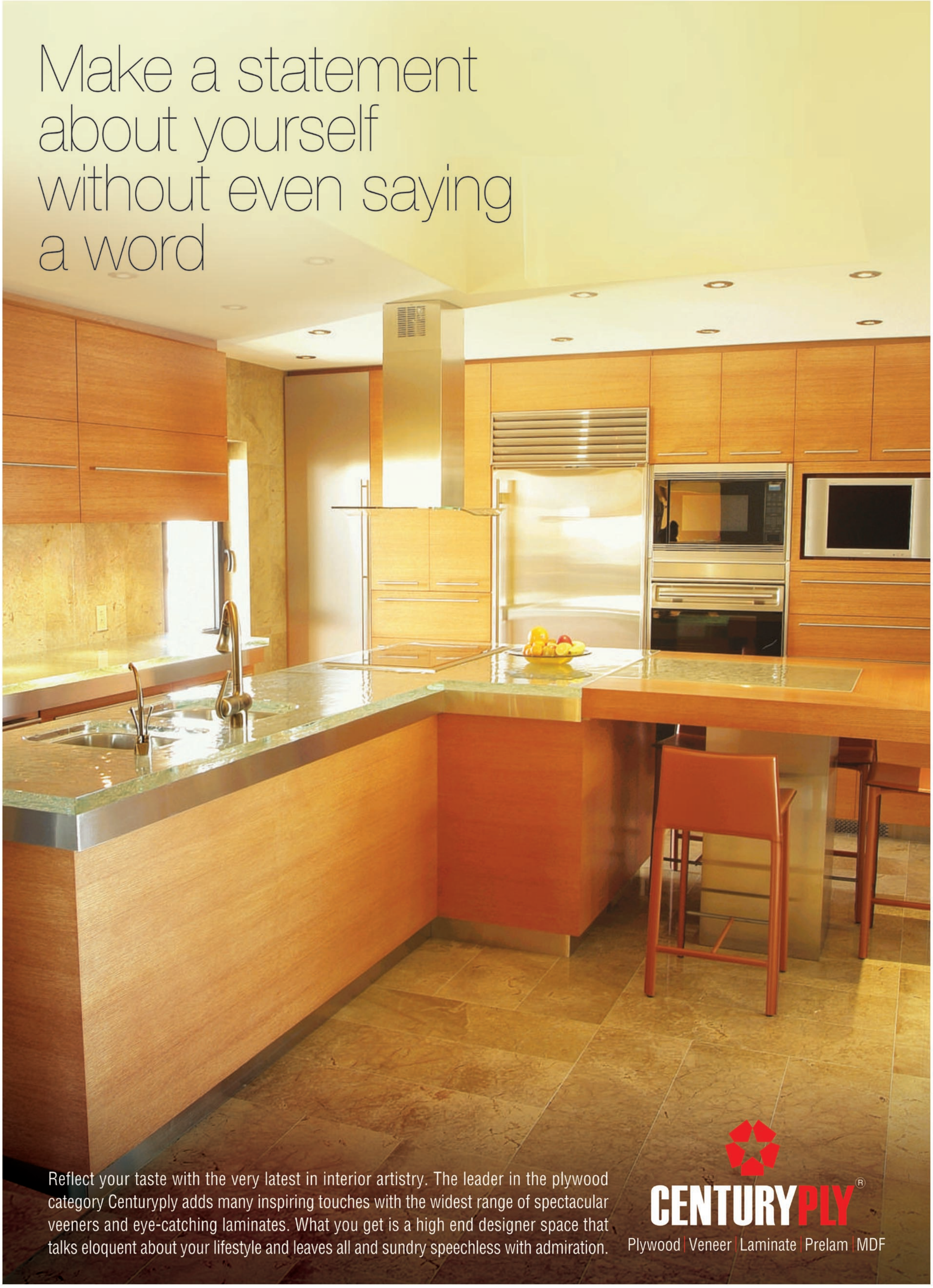

দাম : ৭.০০ টাকা